শেখ আবুল কাসেম মিঠুন

ইসলামে চলচ্চিত্র ও নাটক

ইসলামে চলচ্চিত্র ও নাটক

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন

দেশজ প্রকাশন

www.bjilibrary.com

ইসলামে চলচ্চিত্র ও নাটক

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন

প্রকাশক মনোয়ারুল ইসলাম
দেশজ প্রকাশন
ক-১৫/২/এ, বি-২, (৩য় তলা)
জগন্নাথপুর, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯
মোবাইল: ০১৭০৮১৬৯৩৩৮
ই-মেইল : deshoz2017@gmail.com

প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০২৪
গ্রন্থস্বত্ব মনিরা পারভীন (লেখক পত্নী)
প্রচ্ছদ হাশেম আলী
অনলাইন বুকশপ www.rokomari.com

ISBN 978-984-97658-4-4

মূল্য ২৫০/- টাকা মাত্র।

www.bjilibrary.com

প্রকাশকের কথা

মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেরই রয়েছে বিনোদন চাহিদা। কেউ এটা উপেক্ষা করতে পারে না। স্বভাবগতভাবে মানুষের ভেতরে সৃষ্টি হয় এই চাহিদা। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত সব মানুষই বিনোদনের প্রতি ঝুঁকে যায়। চলচ্চিত্র ও নাটক সেই বিনোদনের খোরাক যোগানোর অন্যতম মাধ্যম। তবে এই চলচ্চিত্র ও নাটক নির্মাণের কোন মডেল নেই ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের সামনে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটি গৎ বাঁধা প্রথায় আটকে আছে জনপ্রিয় এই সাংস্কৃতিক মাধ্যম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র ও নাট্য আন্দোলন হলেও ইসলামী বিশ্বে উল্লেখযোগ্য কোন আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের সামনে নেই। না থাকার কারণও রয়েছে- ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো থাকে, তারই পরশে পরশে গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে ইসলামী পরিবার এবং সমাজব্যবস্থা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ক্ষমতাধররা তাদের ক্ষমতাকে স্থায়ীকরণের নিমিত্তে মানব রচিত আইন দ্বারা সমাজব্যবস্থা পরিচালনা করতে চায়। আল্লাহর আইনকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠার লড়াই করে থাকে। ফলশ্রুতিতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ সমাজব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয় না; হচ্ছে না। আর চলচ্চিত্র ও নাটকে ইসলামীকরণও সুদূরপরাহত।

চলচ্চিত্র ও নাটকের কতটা প্রভাব আমাদের সমাজে তা চিন্তা করলে শিহরিত হবার মতো। গায়ের লোম খাঁড়া দিয়ে ওঠার কথা। জাহেলিয়াতকে প্রমোট করার জন্য একটি গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। বিশেষ করে তরুণ শ্রেণীই তাদের মূল টার্গেট। তবে তাদের ফাঁদে এখন সব বয়সী মানুষেরাই। কোন নায়ক-নায়িকা কেমন পোশাক পরছে, তাদের হাঁটা চলার ভঙ্গিমা কেমন; কোন স্টাইলে চুল কাটছে- এসবই আমরা অনুসরণ করছি। এভাবে তাদের সেই জাহেলী চরিত্র আমাদের ভেতরেও অনুপ্রবেশ ঘটছে।

সচেতন মানুষ মাত্রই একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন- আমাদের টিভি চ্যানেলগুলো চলচ্চিত্র ও নাটকের মাধ্যমে আমাদের সৃজনশীল চিন্তা-চেতনা এবং উদ্যম-উদ্যোগের গতি রোধ করে দিচ্ছে। মানসিক বিকারগ্রস্তের পাশাপাশি বিকৃত চিন্তার মানুষে পরিণত করছে। এইসব চলচ্চিত্র ও নাটকে সাময়িক আনন্দ লাভ থাকলেও আমাদেরকে ভোগবাদী, অমানবিক ও ক্ষমতালোভী করে তুলছে।

www.bjilibrary.com

তবে আমাদের করণীয় কী কিছু নেই? একটাই পথ-বর্তমান জাহেলিয়াত সমাজে ইসলামী কাহিনী নির্মাণ ও সেই অনুযায়ী চলচ্চিত্র তৈরিই যুক্তিযুক্ত। আর সত্যিকারের মুসলমান চরিত্রে যারা অভিনয় করবেন তাদের ব্যক্তিগত আমল যেন মুসলমানের মতই হয়। তাহলে ধ্বংসের কিনারে দাঁড়ানো এই জাতিকে কিছুটা হলেও উদ্ধার করা সম্ভব।

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নায়ক, চলচ্চিত্রকার ও নির্মাতা ছিলেন। এক সময় তিনি প্রচলিত ধারার চলচ্চিত্রের সঙ্গে জোরালোভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২০০০ সালে তিনি সিনেমার অভিনয় থেকে সরে আসেন এবং আদর্শিক ধারায় কাজ শুরু করেন। তাঁর গল্প ও পরিচালনায় 'আহ্বান' চলচ্চিত্র এবং তার চিত্রনাট্যে 'আল্লারাখা' ও 'ওরাও মানুষ' নাটক ছাড়াও বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র ও নাটক নির্মিত হয়েছে। তাঁর অভিনীত সর্বশেষ টেলিফিল্ম 'যোগফল'। শিশুদের নিয়ে দিগন্ত টেলিভিশনে তার ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটিও ছিল বেশ জনপ্রিয়। অভিনয় থেকে সরে আসলেও শেখ আবুল কাসেম মিঠুন আজীবন সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি মৃত্যুর আগপর্যন্ত স্ক্রিপ্ট রাইটার, পরিচালক, গীতিকার ও সুরকার হিসেবে কাজ করেছেন। কবি মতিউর রহমান মল্লিক-এর মৃত্যুর পর তিনি 'বাংলাদেশ সংস্কৃতিক কেন্দ্র'র হাল ধরেন।

তিনি চলচ্চিত্রের ভেতরে-বাইরের সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেইসব জানা-অজানা খবরাখবর জানিয়েছেন 'ইসলামে চলচ্চিত্র ও নাটক' গ্রন্থে। চলচ্চিত্র ও নাটকের ইসলামী রূপরেখা, জাহেলী চলচ্চিত্র ও ইসলামী চলচ্চিত্রের সমস্যা ও সমাধানের দিকনির্দেশনা, ইসলামী চলচ্চিত্র আন্দোলন সংগঠিত করার কৌশল, ইসলামী চলচ্চিত্র ও নাটক নির্মাণের পন্থা ও নির্মাতাদের করণীয় দিকসমূহের বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। এই লেখাগুলো তিনি ইসলামী জীবন ও আদর্শে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হবার পরে লিখেছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখাগুলো ছাপা হয়েছে। অধিকাংশ লেখার সময়কাল ২০০৪-২০১৫ সাল। দেশজ প্রকাশন থেকে শেখ আবুল কাসেম মিঠুনের 'ইসলামে চলচ্চিত্র ও নাটক' গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে সত্যিই ভালো লাগছে। গ্রন্থটি ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের গাইডলাইন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করছি।

মনোয়ারুল ইসলাম

প্রকাশক

দেশজ প্রকাশন

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

ইসলামী চলচ্চিত্র ও নাটক	৭
কেন নাটক	১৪
জাহেলিয়াত চলচ্চিত্র ও ইসলামী চলচ্চিত্র : সমস্যা ও সমাধান	২৫
ইসলামী চলচ্চিত্র আন্দোলন	৫৫
চলচ্চিত্র তথা মিডিয়ার জন্য লেখালেখি	৬৯
সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ন	৮১
ইসলামী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জ্ঞাতব্য বিষয়	৯৬

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

ইসলামী চলচ্চিত্র ও নাটক প্রসঙ্গে

পৃথিবীতে একটা বিষয় চলে আসছে, তা সবার কাছে পরিচিত এবং গ্রহণীয় হয়ে গেছে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন এই একই বিষয় চর্চা করে তখন তা হয়ে যায় প্রথাগত। তা হয়ে দাঁড়ায় একটা মডেল। সবাই তাকে অনুসরণ করেই চর্চা করে থাকে। চলচ্চিত্র ও নাটক তৈরি তেমনি একটা প্রথাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই প্রথা ভাঙ্গার জন্যই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র এবং নাট্য আন্দোলন হয়েছে। আন্দোলনকারীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সফল। কিন্তু ইসলামী বিশ্বে চলচ্চিত্র বা নাটক নিয়ে আন্দোলন তো দূরের কথা উল্লেখযোগ্য কোনো চর্চাই হয়নি। আর তাই চলচ্চিত্র ও নাটক তৈরির ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক কর্মীদের সামনে কোনো মডেল নেই। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো থাকে, তারই পরশে পরশে গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে ইসলামী পরিবার এবং ইসলামী সমাজব্যবস্থা। ইসলাম আগমনের পর থেকে ৩০ বছর ধরে ইসলামের সেই সুস্থ সুন্দর ও কল্যাণকর রূপ পৃথিবীর মানুষ দেখেছে। আজকের পৃথিবীতে যেখানে যতো কল্যাণময় রূপ আমরা দেখি তা সবই ইসলামের অবদান। কিন্তু ক্ষমতাধর মানুষরা তাদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য নিজেরা আইন রচনা করে আল্লাহর জারিকৃত আইনব্যবস্থার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে তাকে বিকৃত করেছে, আবার কখনো বাতিল করেছে। আজ অবধি সেই ভাঙা-গড়ার খেলা চলছে। তাই বর্তমানে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ আমরা কোনো সমাজব্যবস্থায় দেখতে পাবো না।

অথচ চলচ্চিত্র ও নাটকের গল্পের উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করা হয় সমাজের ভেতর থেকে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, লেন-দেন, আচার-আচরণ এবং এসব বিষয়বস্তু নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তাই-ই হচ্ছে চলচ্চিত্র ও নাটকের গল্পের মূল উপাদান ও উপকরণ। এই যে দ্বন্দ্ব, এর যে উৎসমুখ, সেই উৎসমুখের ভিত্তি সম্পর্কে আমরা যদি চিন্তা করি তবে দেখবো যে, জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক যে আইন-কানুন প্রবর্তিত এবং প্রচলিত, তা আমাদের প্রতিটি

www.bjilibrary.com

লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে যেমন পরিচালনা করছে তেমনি নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের সকল কার্যক্রমকে। আমাদের সমাজের মানুষ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত আইনব্যবস্থাকে এমনভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছে যে তাকে আর বলে দিতে হয় না কোন কাজ করা উচিত আর কোন কাজ করা উচিত নয়। বেশিরভাগ মানুষ জানে অপরাধমূলক কোনো কাজ করলে তার কী ধরনের শাস্তি হতে পারে। রাষ্ট্রের আইনব্যবস্থায় মানুষ অভ্যস্ত বলেই সে স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কাজ করে যায়। দ্বন্দ্ব-সংঘাতও করে স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে। রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থা শুধু মানুষের জীবনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে না, তার মানসিক অবস্থাকেও আমূল পরিবর্তন করে ফেলে। এর ফলে মানুষ যে জীবনব্যবস্থায় পরিচালিত হয় এবং একে অপরের মধ্যে যে সম্পর্ক, বন্ধুত্ব বা দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে তাই নিয়েই তৈরি হয় চলচ্চিত্র ও নাটকের কাহিনী। অতএব দেখা যাচ্ছে চিন্তার মূলভিত্তি হচ্ছে দুটি, এক. আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং সেই ভিত্তির উৎসমুখ হচ্ছে আল্লাহর দেয়া আইনব্যবস্থা। দুই. ক্ষমতাধরদের প্রতি ঈমান এবং সেই ভিত্তির উৎসমুখ হচ্ছে তাদের তৈরি করা আইনব্যবস্থা। দুটি রাস্তা–হয় এটা নয় ওটা।

সারা পৃথিবীতে যে চলচ্চিত্র ও নাটক হচ্ছে তা এই শোষাক্ত বিপরীত ব্যবস্থার ভিত্তিতে। অতএব ইসলামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক কর্মীদের সামনে কোনো মডেল থাকার কথা নয়। তবে আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণী কৌশল ও সৃজনশীলতার ধারালো শক্তিমত্তা দিয়ে আধুনিক এই জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। রাসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন, 'জ্ঞান-বিজ্ঞান হচ্ছে মুমিনের হারানো বস্তু, অমুসলিমদের কাছে পেলেও তা অর্জন করো।'

এখানে মনে রাখা দরকার, চলচ্চিত্র বা নাটক নিজে কোনো সংস্কৃতির সৃষ্টি করে না। বরং যে সমাজ মানুষ নির্মাণ করে, সেই সমাজের সংস্কৃতিই চলচ্চিত্র এবং নাটক ধারণ করে এবং সাংগঠনিক আকারে তাই-ই ভূমিষ্ট করে। তাই চলচ্চিত্রকে বলা যেতে পারে সকল সংস্কৃতির জননী।

চলচ্চিত্র ও নাটকের গল্প সাহিত্যভিত্তিক হতে পারে। বলা যেতে পারে বিশ্বের স্মরণীয় চলচ্চিত্রের অধিকাংশই সাহিত্যভিত্তিক। উন্নত সাহিত্য, উন্নত চলচ্চিত্র বা নাটক সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু আমাদের যারা গল্প ও উপন্যাস সাহিত্য রচনা করেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের লেখনীর মধ্যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার অনুপস্থিত। ইসলাম ও ইসলাম বহির্ভূত জীবনব্যবস্থার যে পার্থক্য তা নির্ণয় করা পাঠকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। বেশিরভাগ লেখকের সামনে মডেল হিসেবে উপস্থিত থাকে আধুনিক অনৈসলামিক সাহিত্যিকদের রচনা। কিছু কিছু লেখক ইসলামী আদর্শকে সামনে রেখে গল্প ও উপন্যাস রচনা করলেও তার মধ্যে চলচ্চিত্রিক এবং নাটকীয় টেকনিক্যাল গুণগুলো থাকে না। যে কারণে

www.bjilibrary.com

সেসব গল্প ও উপন্যাস নিয়ে উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র বা নাটক তৈরি করা সম্ভব হয় না। সমাজের ব্যক্তি ও সামষ্টিক সমস্যা, তার উৎপত্তি এবং সমাধানের এক ধরনের পন্থা অনৈসলামিক লেখকরা তাদের রচনায় দেখিয়ে থাকেন, যাতে থাকে নিজস্ব মনগড়া নীতি-নিয়ম ও আইনব্যবস্থা, আদর্শিক লেখকরাও যদি তাদের পন্থা অবলম্বন করেন তবে তা আর আদর্শিক থাকে না। কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠায় আন্তন চেখভ, টলস্টয় বা গোর্কীর মতো বিপ্লবী লেখক অথবা কিউবার চলচ্চিত্র পরিচালক আলভারেজ, সোলাস, রাশিয়ার আইজেনস্টাইন, সের্গেই বন্দারচুক, মেক্সিকোর রেমনডো গ্রেসার, চিলির প্যাট্রিসিয়া গুজম্যান প্রমুখ তাদের দর্শন, তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত নীতি-নিয়ম এবং মানব রচিত আইনি আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যে মেধা, পরিশ্রম ও সৃজনশীলতার সাক্ষর রেখে গেছেন তা বিশ্ববাসীর কাছে যেমন হয়েছে নন্দিত তেমনি অনুকরণীয় হয়ে আছে। এই আধুনিক সাংস্কৃতিক হাতিয়ার ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ব্যবহারের জন্য আমাদের সাহিত্যিক নাট্যকার ও চলচ্চিত্রকারীদের জনগণের চিন্তা-চেতনার ভিত্তি, মনস্তাত্বিকতা, সমাজ বিশ্লেষণ এবং তার উৎসমুখকে চর্চা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক এগিয়ে আসা অতীব প্রয়োজন। আমাদের বিত্তবানদেরও প্রেরণা এবং উৎসাহের হাত বাড়ানো উচিত। বলা হয়ে থাকে, রাজনীতিবিদরা কবি-সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের চিন্তা থেকে আইডিয়া সংগ্রহ করে থাকেন। আর তাই-ই পরবর্তীকালে আন্দোলন অথবা রাষ্ট্রীয় নীতির মর্যাদা পেয়ে থাকে।

মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর চলচ্চিত্রও আমাদের আদর্শ হতে পারে না। যেসব দেশ চলচ্চিত্র তৈরি করে যেমন মিশর, লেবানন, কাতার, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশগুলোর শাসকশ্রেণি মূলত মুসলিম নামধারী হলেও তাদের আইনব্যবস্থা নিজেদের তৈরি এবং পাশ্চাত্য থেকে ধার করা বস্তুবাদী আইনব্যবস্থা। বেশিরভাগ মানুষের মন-মস্তিষ্ক এবং জীবন পরিচালিত হয় সেই আইনব্যবস্থার অধীনে। তাই ঐসব দেশের মানুষের দ্বন্দ্ব এবং বস্তুবাদী দেশের মানুষের দ্বন্দ্বের স্বরূপ আর তাদের চলচ্চিত্র ও নাটকের গল্পের চরিত্র, ঘটনা বিন্যাস এবং মনস্তাত্বিক গতিপ্রবাহের স্বরূপ প্রায় একই। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র ও নাটক তা থেকে পৃথক নয়। 'আল মিল্লাতুন জাহেলিয়াত ওয়াহিদা।' সকল জাহেলিয়াতই এক।

তবে এক্ষেত্রে ইরান আমাদের জন্য একটি সাবধানী ও সতর্ক মডেল হতে পারে। একটা ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় চলচ্চিত্র ও নাটকে মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সংযত প্রয়োগরীতির জন্য ইরান প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু যেহেতু আমরা মুসলিম নামধারী অনৈসলামিক শাসকদের অধীনে ইসলামবিরোধী শাসনব্যবস্থায় জীবন-যাপন করি সেহেতু ইরানী চলচ্চিত্র ও নাটকের যে উপাদান উপকরণ তা যদি আমরা অনুসরণ করি তবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভোগবাদী শাসনব্যবস্থার অধীনে সাহিত্যিক,

www.bjilibrary.com

চলচ্চিত্রকার বা নাট্যকারদের মানসিক দুর্বলতায় অশ্লীলতা এবং প্রকট শিরকের জন্ম দিতে পারে। ইরানেও সেই অবস্থা হয়েছিল। তাই আমরা ইরানের চলচ্চিত্র ও নাটকের সূচনালগ্নের পটভূমিকে সামনে রাখতে পারি। ১৬ শতকে মহররম এবং অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি প্রেমের সংঘাত, ধনী-গরিবের দ্বন্দ্ব এবং পারিবারিক ঝগড়াঝাটি নিয়ে ইরানে নাটক মঞ্চস্থ হতো, এসব বিষয়বস্তুই পরবর্তীতে তাদেরকে পাশ্চাত্যমুখী করে দেয়। ১৯ শতকে ইরানে আধুনিক নাটকের পথ চলা শুরু, যা একেবারেই পাশ্চাত্য রঙে রাঙানো। ইউরোপ থেকে জনপ্রিয় নাটক এনে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করে তারা মঞ্চস্থ করতো। ১৮৫১ সালে যখন পাশ্চাত্য কালচার ইরানে মজবুত শিকড় গেড়েছে তখন মীর্জা ফতেহ আলি আখুন্দজাদা নাটকের মাধ্যমে সংস্কারে ব্রতী হন। তার সঙ্গে যোগ দেন মীর্জা আকা তাবরীজি, মীর্জা মালকম খান, নাজেম আল দৌলা প্রমুখ। তাদের নাটকের বিষয়বস্তু ছিল সরকারি দুর্নীতি এবং সামাজিক অনাচার। তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু তাদের উত্তরসূরীরা থেমে থাকেনি। ১৯১১ সালে তেহরানে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হয়। সেখানেও তাদের উত্তরসূরীরা সরকারি দুর্নীতি এবং সামাজিক অনাচার নিয়ে একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকে। ১৯২০ সালে রেজা শাহ্ ক্ষমতায় এসেই নাটকের ওপর কড়া সেন্সর আরোপ করেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক আদর্শ একবার গতি পেলে তাকে থামানো সম্ভব নয় বরং গতিবেগ দ্বিগুণ শক্তিশালী এবং গতিশীল হয়। আজকের ইরানের চলচ্চিত্র ও নাটক সেই আন্দোলনের ফসল।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের শাসক ও গ্রামীণ বিচারক ছিলেন ইসলাম অনুরক্ত আলেম শ্রেণি আর দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অভিভাবক ছিলেন ইসলাম অনুরক্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষীবৃন্দ। সমাজ শাসিত হতো তাদের দ্বারা। তাই তখনকার চলচ্চিত্র ছিল অনেকটা সংযমী। কারণ সমাজের লোকজনের আচার-আচরণও ছিলো অনেকটা সংযমী। আর সমাজের চিত্রটা উঠে আসে চলচ্চিত্র ও নাটকে। অভিনয় শিল্পীদেরকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতো সমাজ। কিন্তু অভিনয় শিল্পীরা তাদের চলচ্চিত্রিক ভদ্রজনিত ইমেজ দিয়ে একটা সম্মানিত পজিশন তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলো। মুক্তিযুদ্ধের পরে ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ার কারণে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমাদের সমাজব্যবস্থায় অবক্ষয় নেমে আসে। পরিকল্পিত উপায়ে শক্তির দাপটে আলেম শ্রেণিকে সরানো হয় মর্যাদার আসন থেকে, ইসলামপন্থি বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক বিষয় সম্বলিত রচনাদি বাদ দেয়া হয় পাঠ্য-পুস্তক থেকে, তাদেরকে দেশের পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়া একঘরে করে দেয় অথবা তাদের চরিত্রকে মৌলবাদী বলে কলুষিত করা হয়। মহানবী (সা.) এবং সাহাবা কেরাম (রা.) দের শ্রেষ্ঠতম বাণীর স্থান দখল করে নেয় পরকাল অস্বীকারকারী ভোগবাদী, বস্তুবাদী কবি

www.bjilibrary.com

দার্শনিকদের বাণী। তাই চলচ্চিত্র ও নাটকে ঢুকে পড়ে অশ্লীলতা, অরাজকতা এবং অমানবিকতার জয়গান, যা ভোগবাদীর চূড়ান্ত। ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সেজে এসব অপসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। তাদের দ্বারাই এখন পর্যন্ত এসে তা আরো শক্তিশালী হয়েছে।

এ অবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক কর্মীদেরকে এমন সব চলচ্চিত্র ও নাটক তৈরি উদ্ভাবন করা দরকার যা প্রথাগত নয়, যা ইসলামের সৌন্দর্যকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তুলে ধরবে, পাশাপাশি অনৈসলামিক আইন-বিধানের অযৌক্তিক, অমানবিক এবং অকল্যাণকর প্রত্যেকটা বিষয়কে বিশ্লেষণ করে মানুষের সামনে যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করবে। শুধু তাই নয়, ইসলামের প্রতিটি বিধি-বিধানকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিচিত করা, তার কল্যাণকর ব্যবহার এবং মানুষের কাছে প্রিয় করে তোলার জন্য চলচ্চিত্র এবং নাটকের কোনো বিকল্প নেই। আর সেই চলচ্চিত্র আর নাটক হবে অন্যান্য দেশের জন্য মডেল। এই মডেল তৈরি করতে হবে নিজস্ব সৃজনশীলতা দিয়ে, অন্য কাউকে মডেল করে নয়। মনে রাখা দরকার, ইসলাম স্বয়ং-সম্পূর্ণ। ইসলামই সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণকে পার্থক্য করে দেখিয়েছে। শুধু অ আ ক খ এবং নাম সই করতে পারাটাই শিক্ষিত সমাজ গঠনের জন্য যথেষ্ট নয় বরং ইসলামী শিক্ষাই হলো মানবতার আসল এবং মূল শিক্ষা। আর আদর্শিক চলচ্চিত্র ও নাটক জনগণকে সংস্কৃতিপ্রবণ করে তুলবে। ইসলামী মৌলিক শিক্ষাকে তাদের অন্তরাজ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দান করবে। প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি কথা মনে করা দরকার- মুমিন ব্যক্তির আনন্দ এবং অমুমিন ব্যক্তির আনন্দ একই বিষয়বস্তু থেকে আসে না।

আল্লাহ তায়ালা একটি লিস্ট দিয়ে মানুষকে এই বাজারে পাঠিয়েছেন। লিস্ট মোতাবেক বাজার করে আসল ঘরে ফিরে যাবার জন্য। মূল উদ্দেশ্য হলো সেই আসল ঘরের প্রয়োজন মেটানো। মুসলমানদের পরিচালিত বাজার [রাষ্ট্রে] ব্যবস্থায় মানুষ যদি সেই লিস্ট অনুযায়ী কেনাকাটা করতো তবে সমাজ বা রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অন্যায়-অবিচার, হানাহানি, শোষণ-বঞ্চনা এসবের প্রকোপ কমে যেতো।

একজন অমুসলিম অশ্লীলতা, নিষ্ঠুরতা এবং অবৈধ বিভিন্ন পন্থা সম্বলিত দৃশ্য দেখতে উৎসাহী হতে পারে, তাতেই তাদের আনন্দ কিন্তু একজন মুমিনের কাছে ওসবে যন্ত্রণা। মুমিনের আনন্দ আল্লাহর নির্দেশ পালনে এবং আল্লাহর স্মরণে [জিকিরে]। কারণ একজন অমুসলিমের চিন্তার উৎস এমন এক মানসিক ভিত্তি থেকে যা ভোগ-বিলাস, প্রভুত্ব করা এবং স্বার্থবাদিতা থেকে গঠিত। ফলে তার আনন্দ প্রাপ্তি হয় অশ্লীলতা, অত্যাচার, ভোগবিলাসের সামগ্রী ও সেসবে বিকারগ্রস্ত

www.bjilibrary.com

লোকজনের জীবনাচরণ দেখে এবং তার স্বপ্ন দেখে। তিনি কখনো বিশ্বাস করেন না ইহকাল থেকে পরকাল সুন্দর এবং চিরস্থায়ী। অন্যদিকে একজন মুমিনের চিন্তার উৎস এমন এক মানসিক ভিত্তি থেকে যে ভিত্তিটা মানুষের কল্যাণের জন্য ত্যাগ, সহনশীলতা এবং নিজের প্রিয় স্বার্থগুলো ত্যাগ করে মানুষ ও মানবগোষ্ঠীর জন্য কাজ করার এক নির্ভেজাল ঐশ্বরিক গুণাবলীতে গঠন হয়েছে। তাই সে আনন্দিত হয় শ্লীলতা দেখে, সুবিচার দেখে, ন্যায়পরায়ণতা দেখে এবং ভোগবিলাস ত্যাগ করে মানুষ ও মানবগোষ্ঠীর সুখ-সমৃদ্ধশালী জীবনযাপনে ভূমিকা রেখে। এসবের উৎস পবিত্র সৎচিন্তা থেকে। এই সৎচিন্তার উদ্ভব ইহকাল থেকে পরকাল সুন্দর ও চিরস্থায়ী এই বিশ্বাস থেকে।

অতএব আমাদের সমাজে যারা মুমিন তারা এমনসব বিষয়বস্তু নিয়ে চলচ্চিত্র ও নাটক তৈরি করবেন যার উপাদান ও উপকরণ হবে- ইসলাম যে মানুষ ও মানবতার কল্যাণে এসেছে- প্রতিটি চরিত্র, সংলাপ এবং ঘটনা বিন্যাসের ধারাবাহিকতায় তা বিশ্লেষণ করে যৌক্তিকভাবে পরিবেশন করা। যার প্রতিটি স্তরে স্তরে থাকবে আল্লাহর দেয়া আইন-বিধানের কল্যাণকারিতার যৌক্তিক বিশ্লেষণ। পাশাপাশি মানুষের তৈরি আইন-বিধানের স্বার্থানুখ কদার্যতা তুলে ধরা। কিন্তু তা কোনোক্রমেই যুক্তির সীমা ছাড়াবে না।

চলচ্চিত্র ও নাটক তৈরির ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার, এক. গল্প ও উপন্যাস লেখকদেরকে কাউকে অনুসরণ বা মডেল না করে শুধুমাত্র আদর্শকে ভিত্তি করে নিখাঁদ মৌলিক গল্প ও উপন্যাস রচনা করা। দুই. চলচ্চিত্র ও নাটক যারা তৈরি করবেন তারা যেন প্রথমেই উক্ত বিষয়ে টেকনিক্যাল জ্ঞান অর্জন করে নেন। এই দু'টি মৌলিক বিষয় আয়ত্তের ওপর নির্ভর করে বৃহত্তর মিডিয়াতে আদর্শকে বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার যোগ্যতা।

উপসংহার

কোনো বিষয়ে ভাসাভাসা জ্ঞান নিয়ে চর্চা করলে সেই বিষয়টি যখন সাংস্কৃতিক বিষয় হয় তখন তা বিকৃত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই আপস করা চলবে না। জাতে ওঠার নামে জাহেলিয়া চাকচিক্যতায় কোনোভাবেই নিজের চোখ ঝলসানো উচিত নয়। অথবা জাহেলিয়াতের কোনো নামকরা লোককে কাছে এনে নিজেকে সম্মানিত করে তোলার মিথ্যা ভণ্ডামিতেও যেন নিজেকে নিমগ্ন না করি। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো বিদায়াতপন্থি ব্যক্তিকে কোনো সম্মান ও মর্যাদা দান করে সে আসলে ইসলামেরই প্রাসাদ চূর্ণ করিয়া দেয়ার কাজে সাহায্য করে।" তাই জাহেলিয়াতের সিঁড়িতে পা রেখে নিজেকে ভাগ্যবানের বদলে

www.bjilibrary.com

গোনাহগার যে ভাবতে পারে সেইতো ইসলামের প্রাসাদ সুদৃঢ় করে। তাবুক যুদ্ধে হযরত কা'ব ইবনে মালিকের (রা.) মতো। গাসসান বাদশা রেশমী কাপড়ে মোড়া চিঠিতে লিখেছিল, "তোমাদের মনিব তোমার ওপর জুলুম করছে, আমার কাছে চলে এসো, তোমাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবো।" কা'ব (রা.) চিঠিখানি আগুনে পুড়িয়ে সিজদায় পড়ে গেলেন। "ইয়া আল্লাহ আমি কত বড় গোনাহগার, এ কত বড় মসিবত যে আজ কাফেররা আমাকে সম্মান দেখানোর জন্য ডাকছে।"

আমরা জানি সূর্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমরা ছায়াকে অনুসরণ করি। কিন্তু বিষয়টা যদি এমন দৃষ্টিতে আমরা দেখি যে, আমরা ছায়াকে ধরতে চাচ্ছি কিন্তু সে পালিয়ে পালিয়ে আমাদেরকে তার পেছনে ছুটতে বাধ্য করছে। জাহেলিয়াতও তেমনি, একজন মুমিনের কাছে সে ছায়া সমতুল্য। জীবনপাত হয়ে যাবে, ছায়ার পেছনে দৌড়াবার নেশা ফুরাবে না। তাই খাঁটি মুমিন জাহেলিয়াত নামক ছায়ার পেছনে দৌড়ায় না।

মরণের পরে যেনো 'নাম' থাকে মানুষের অন্তরে
বুদ্ধি আর শ্রমের যতো ঘাম সেদিকেই ছুটে মরে
জাহেলী জীবনের এই অন্ধকার
কূল নেই তীর নেই যেনো সীমাহীন চরাচর
প্রতিযোগিতায় মত্ত এতেই
দুনিয়ার ইনসানে–
জাহেলী জীবনে।

সূর্যের তেজে আমাদের চোখ জ্বলবে, গা পুড়বে; তবুও আমাদের সাহসী বীরের মতো শক্তভাবে সূর্যের দিকে অর্থাৎ সত্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, তখন ছায়া অর্থাৎ জাহেলিয়াত আমাদেরকে অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। সাংস্কৃতিক কর্মীদেরকে চলচ্চিত্র, নাটক, উপন্যাস, গল্প, মিডিয়া যে দিকেই তার পদচারণা হোক না কেন তা যেন সত্যের দিকে হয়। ইসলামের দিকে হয়। জাহেলিয়াত নামক ছায়ার পেছনে বোকার মতো সে যেন না দৌড়ায়। যেন ছায়া তাকে অনুসরণ করে।

www.bjilibrary.com

কেন নাটক

মাধ্যম হিসেবেই নাটকের উৎপত্তি। কিসের মাধ্যম? তুষ্টিসাধনের মাধ্যম। কার তুষ্টি? নাটক বিষয়ের প্রধান শাস্ত্র 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে ভরতমুনি লিখেছেন, 'দেবগণের তুষ্টি, রাজগণের তুষ্টি এবং অন্যান্য লোকের তুষ্টিসাধন।' নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি কেউ বলেন হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের দুইশত বছর পূর্বে লেখা আবার কেউ বলেন ঈসা (আ.) এর জন্মের একশত বছরের মধ্যে লেখা। সে যখনই হোক, তিন শ্রেণীর তুষ্টিসাধনের জন্য ভরতমুনি রঙ্গালয়ের মাপজোঁকও তার গ্রন্থে দিয়ে দিয়েছেন। যেমন, 'মর্তবাসীর রঙ্গালয় হবে চৌষট্টি হাত লম্বা আর বত্রিশ হাত চওড়া।' কারণ বড় রঙ্গালয়ে অভিনয় খুলবে না, অভিনেতার কথা শোনা যাবে না, তার ভাবভঙ্গিও দর্শকের দৃষ্টিগোচর হবে না।

ভরতমুনির পূর্বে হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের প্রায় চারশত বছর আগে নাটক বিষয়ে পৃথিবীর দু'প্রান্তে দুটি সূত্র গ্রন্থ বা ব্যাকরণ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি ভারতে এবং অন্যটি গ্রীসে। ভারতে নাট্য বিষয়ে যে গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া গেছে তার রচয়িতা পানিনি এবং পতঞ্জলী। অবশ্য আল বিরুনী তার ইতিহাস গ্রন্থে 'পতঞ্জলী' বই এর নাম ও লেখকের নাম একই বলে উল্লেখ করেছেন। আরও উল্লেখ করেছেন সুদীর্ঘকাল ধরে এমনকি ভারতে ইসলামী শাসনব্যবস্থার সময় পর্যন্ত বেশীরভাগ রচনাই হতো ছন্দে অর্থাৎ কাব্যে। কারণ কবিতা মুখস্থ করতে ও মুখস্থ রাখতে সুবিধা হতো। তাই ধরে নেয়া যায় তখনকার, নাটক হতো কাব্যিক ছন্দে। পানিনি ও পতঞ্জলীর রচনায় রঙ্গমঞ্চ, অভিনেতা, অভিনেত্রী, বাদ্যযন্ত্র এসবের উল্লেখ আছে। ঐ একই সময়ে গ্রীসে দার্শনিক অ্যারিস্টটল নাটক বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম 'পোয়েটিক্স্'। এই দুটি গ্রন্থ পড়ে বুঝা যায় তখন নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ হতো এবং ঐ সব নাটক দেখে, বিশ্লেষণ করে, চিন্তা ভাবনা করে পানিনি, পতঞ্জলী ও অ্যারিস্টটল তাদের গ্রন্থ রচনা করেন। আর সেই গ্রন্থে নাটকের মূল-নীতি, কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, নাটকের পরিবেশ এবং নাটকের সংজ্ঞা বিধৃত আছে।

www.bjilibrary.com

ভারতের নাটকগুলির নাম পাওয়া যায় না তবে গ্রীসের নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হলো 'সফোক্লিস, ইডিপাস এবং অ্যারিস্টোফেনিস' ইত্যাদি।

আজও পাশ্চাত্যে নাটকের ছাত্র ও সমালোচকের কাছে অ্যারিস্টটলের রচনা একটি সারগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত।

উক্ত গ্রন্থে ২৬টি অধ্যায় আছে। ঐসব অধ্যায়ে আছে কাব্য, সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, ট্রাজেডি, প্লট বা কাহিনী বিন্যাস, নাট্যকারের জন্য নিয়মাবলী ইত্যাদি। অন্যদিকে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে ছত্রিশটি অধ্যায় এবং তাতে ছয় হাজার শ্লোক রয়েছে। এতে আলাচিত হয়েছে, নাট্যের পৌরাণিক ভিত্তি, নাট্যশালার গঠন, সঙ্গীত, নৃত্য, পোশাক, রূপসজ্জা, নাটকের শ্রেণী বিভাগ, অভিনেতার ভূমিকা, নাটক ও অভিনয়ের সমালোচনা, নাচের ভঙ্গিমা ইত্যাদি।

ভরতমুনি নাটকের সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'দেবতা অসুর রাজা এবং গৃহস্থ মানুষদের কর্মের অনুসরণ'। আর, 'বেদের গাথা আর অর্ধ ঐতিহাসিক উপাখ্যান থেকে নেয়া কাহিনীগুলিকে অলংকৃত করে পৃথিবীবাসীদের আনন্দ দান করবার উপযোগী করে তুলতে পারলে তাদের আমরা নাট্য বলব।

অন্যদিকে অ্যারিস্টটল কোন দেব-দেবীর কথা বলেননি। তার সংজ্ঞার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা, মানুষের জীবন এবং ক্ষমতা এগুলি দিয়েই কাহিনী বিন্যাস হবে। ভরতমুনি নাটকে রস সৃষ্টির জন্য ৯টি রসের উল্লেখ করেছেন, শৃঙ্গার, হাস্য, শান্ত, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়ঙ্কর, অদ্ভূত এবং বীর। এসব রসের ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। বলেছেন, মশলা, শাক সব্জি আর নানা রকম উপকরণ মেশালে তরকারির যেমন স্বাদ হয়, সেইরকম স্থায়ী কতকগুলি ভাবে সংযুক্তির ফলে রসের সৃষ্টির হয়।

উপরোক্ত দুটি গ্রন্থ এবং তাতে সন্নিবেশিত সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যাকে মূলসূত্র হিসেবে ধরে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ হয়ে এসেছে সুদীর্ঘকাল।

কুরআনে নবী ও রাসূলদের সমাজের ছবি আঁকা হয়েছে। আরবদেশে যেহেতু কুরআন অবতীর্ণ হয় এবং আরবী ভাষাভাষীদের তাৎক্ষণিকভাবে কুরআনের আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে টার্গেট করা হয়; তাই তাদের জানার পরিধির মধ্যকার নবী-রাসূলদের আলোচনা এখানে করা হয়েছে। আবার এই মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর পশ্চিম এশীয় ভূ-মধ্যসাগরীয় এলাকাটিই মানবসভ্যতার আদি পিঠস্থান। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সভ্যতার নিদর্শনাবলী এখানে রয়েছে। কাজেই সেই দৃষ্টান্তগুলি উপস্থাপন করাও কুরআনের দাওয়াত গ্রহণকারী জনবসতির জন্য খুবই উপযোগী ছিল এবং এগুলি অনুধাবন করা তাদের পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না।

www.bjilibrary.com

কুরআনে কোনো ধারাবাহিক সমাজ চিত্র তুলে ধরা হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে সৎ ও অসৎ সমাজের আলোচনা করা হয়েছে ব্যাপকভাবে। এতে তাদের কাঠামো, অবয়ব ও চরিত্র ফুটে উঠেছে। যেমন, প্রথম সমাজের প্রথম পাপটির কথা এভাবে বলা হয়েছে, আদমের দু'পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে ঠিকমতো শোনাও যখন তারা দুজন কুরবানী করেছিল, একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অপরজনেরটা কবুল হলো না। তাদের একজন বললো, আমি তোমাকে হত্যা করবোই। অন্যজন বললো, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন। তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত তুললেও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য হাত তুলবো না। আমি তো রাব্বুল আলামীন আল্লাহকে ভয় করি। তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন করো এবং অগ্নিবাসী হও, এটাই আমি চাই এবং এটাই জালেমদের কর্মফল। তারপর তার চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাকে উত্তেজিত করলো এবং সে তাকে হত্যা করলো। এর ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। (আল মায়েদাঃ ২৭-৩০)

হযরত লুত (আ.)-এর কওমের চারিত্রিক বিকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, আর স্মরণ করো লুতের কথা। সে তার কওমকে বলেছিল, 'তোমরা জেনে শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছো? তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ কওম।' (আন নামল : ৫৪-৫৫)

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের পূর্ব পুরুষ হতে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়ে মিশরীয় সমাজের উচ্চ ঘরানার মেয়েদের চরিত্রের নৈতিক মানের একটি চিত্র আল্লাহ এভাবে অংকন করেছেন, 'নগরে কতিপয় নারী বললো, আযীযের (গভর্নর) স্ত্রী তার যুবক দাসের সাথে অসৎকর্ম কামনা করছে। প্রেম তাকে উম্মত্ত করেছে। আমরাতো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। স্ত্রীলোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনলো তখন সে তাদের ডেকে পাঠালো। তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করলো। তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল। আর ইউসুফকে বললো, ওদের সামনে বের হও। এরপর তারা যখন তাকে দেখলো তখন তার গরিমায় তারা অভিভূত হলো এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো। তারা বললো, অদ্ভূত আল্লাহর মাহাত্ম্য। এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা। সে বললো, এই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছো, আমি তো তার থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছি কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। আমি তাকে যা আদেশ করেছি সে যদি তা না করে তবে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং অবশ্যই সে হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা ইউসুফঃ ৩০-৩২)

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সঙ্গী-সাথীগণ যে সমাজ ও পরিবেশ তৈরি করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, মুহাম্মাদ আল্লাহর

www.bjilibrary.com

রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জিলেও। (আল ফাতহ : ২৯)

কুরআনী সংস্কৃতির : তিনটি অঙ্গ

আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যের ভিত্তিতে কুরআন মানসিক সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি কাঠামো তৈরি করেছে। একদিকে মুমিন ও মুসলিম বান্দা এবং অন্যদিকে কাফের ও মুশরিক। মুমিন ও মুসলিম গোষ্ঠী আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। অর্থাৎ আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতাকে মেনে নিয়েছে। সমস্ত ক্ষমতার উৎস হিসেবে আল্লাহকে গণ্য করেছে এবং নিজের সমস্ত ক্ষমতাও আল্লাহ প্রদত্ত বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই সে আল্লাহর ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হয়েছে।

অন্যদিকে রয়েছে কাফের ও মুশরিক দল। আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতাকে পুরোপুরি অথবা আংশিক অস্বীকার করে এবং কোথাও অনুমোদন ছাড়াই তার স্বীকৃতি দিলেও কোনো জাগতিক স্থূল ও সূক্ষ্ম মাধ্যমের গোলকধাঁধায় তারা মূলত তাকে অস্বীকারই করে বসেছে। তাই তার প্রকৃত আনুগত্যের কোনো তোয়াক্কাই তারা করে না। বরং যারা আল্লাহর প্রকৃত আনুগত্য করে তাদের প্রতি তারা বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদেরকে নিজেদের চিরন্তন শত্রু ভেবে তাদের বিরুদ্ধে মারমুখী অবস্থান নেয়। এটা মূলত তাদের আল্লাহর পূজা নয়, প্রবৃত্তি পূজা। আল্লাহর আনুগত্য নয়, প্রবৃত্তির আনুগত্য, আল্লাহর হুকুম ও বিধানের পরিবর্তে শয়তানী প্ররোচনাই তাদের মূল অনুপ্রেরণা।

তাই কাফের ও মুশরিকদের সাংস্কৃতিক জীবন এবং মুমিন ও মুসলিমদের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে আসমান ও জমিনের ফারাক।

কুরআন যে সাংস্কৃতিক অবয়ব নির্মাণ করেছে তার প্রধান ও মৌলিক অঙ্গ তিনটি।

এক. তওহীদের বিশ্বাস। এটাকে কেবলমাত্র একটি অঙ্গ না বলে বরং প্রধান অঙ্গ, মূল অঙ্গ এবং একটি গাছের কাণ্ডের মতো বিবেচনা করা যেতে পারে। বিশ্বের ও বিশ্বের বাইরের সবকিছুর স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তিনি একাই সবকিছু চালান। সৃষ্টি প্রতিপালন ও ধ্বংস এবং আবার সৃষ্টি সবই তিনি একাই করেন। এতে কেউ তার সাথী, সহযোগী বা শরীক নেই। সিদ্ধান্ত তিনি একাই গ্রহণ করেন। এতেও তার শরীক নেই। কোনো কিছু করতে ও সিদ্ধান্ত নিতেও তার সময়ের প্রয়োজন হয় না। তিনি বলেন, 'হও' এবং হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

দুই. আখেরাতে বিশ্বাস। তওহীদ-বিশ্বাসেরই একটি প্রধান শাখা আখেরাত বিশ্বাস। পৃথিবীর জীবনের মতো আর একটি অবধারিত, তবে চিরন্তন জীবন হচ্ছে আখেরাত। বরং পৃথিবীর সাময়িক জীবনকে আখেরাতের চিরন্তন জীবনের জন্য পরীক্ষাগৃহে পরিণত করা হয়েছে। এই এক-দেড়শো বছরের সময়কালের ভিত্তিতে আখেরাতের চিরন্তন ও চিরস্থায়ী জীবন গড়ে ওঠে। কাজেই আখেরাতের জন্য পৃথিবীর জীবনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর প্রত্যেকটি কাজের হিসাব-নিকাশ হবে কিয়ামতের তথা শেষ বিচারের দিন। মৃত্যুর পর থেকে শুরু হচ্ছে এই বিচারের পর্ব। মৃত্যুর পর এবং কিয়ামতের আগে যে সময়কালটি তাকে বলা হবে 'আলমে বরযখ' বা বরযখের জীবন। পরীক্ষার পর যেমন খাতা দেখা শুরু হয়, এ বরযখী জীবন হচ্ছে তেমনি খাতা দেখার সময়। এরপর কিয়ামতের দিন তার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। আর এই ফলাফলের ভিত্তিতে অনন্ত চিরন্তন আখেরাতের জীবনের মর্যাদা ও অবস্থান নির্ধারিত হবে।

একজন মুমিন ও মুসলিম এই আখেরাতে পুরোপুরি বিশ্বাস করে এবং এই আখেরাতের জন্যই তারা পৃথিবীতে জীবন-যাপন করে। ফলে কাফের ও মুশরিক থেকে তার জীবনধারা হয় সম্পূর্ণ আলাদা। সে ভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্ম দেয়।

তিন. কুরআনী সংস্কৃতির তৃতীয় অঙ্গটি হচ্ছে 'আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার'। এ সংস্কৃতির প্রকাশ, বিকাশ, ও বিস্তার ভালো কাজ করার আদেশ দেয়াও মন্দ কাজ করতে নিষেধ করার মধ্যদিয়ে ঘটে। নিজে ভালো কাজ করা ও অন্যকে ভালো কাজ করার আদেশ করা এবং নিজে মন্দ করা না করা এবং অন্যকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখাকে এককথায় বলা হয় 'আমলে সালেহ।' আল্লাহ যে কাজগুলি করার হুকুম দিয়েছেন এবং যেগুলি করতে সুস্পষ্ট নিষেধ করেননি সেগুলিই মারুফ। আর আল্লাহ যেগুলির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন সেগুলিই মুনকার। মুমিন ও মুসলিমদের দায়িত্ব হচ্ছে, 'ইয়ামুরুনা বিল মারুফ ওয়া ইয়ানহাওনা আনিল মুনকার'। অর্থাৎ তারা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে। ভালোর পরিচর্যা ও মন্দকে বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত করার এই প্রবণতা কুরবানী তথা মুমিন ও মুসলিম সংস্কৃতির মৌলিক পরিচয়। কোনো কুফরী ও মুশরিকী সংস্কৃতি এ বিষয়টিকে ঠিক এ দৃষ্টিতে বিচার করে না। তার বিচারের মাপকাঠিতে পার্থিব লাভ-ক্ষতি একটি বড় বিষয় হয়ে দেখা দেয়। এখানেই কুরআন ও অকুরআনী সংস্কৃতির পার্থক্য।

তাই কুরআনী সংস্কৃতি বিশ্বকে প্রকৃত সুন্দর ও মহীয়ান করে তোলে, যা অকুরআনী সংস্কৃতির পক্ষে সম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

ভারতবর্ষে ইসলামী শাসনামলে মূর্তি নির্মাণ, ছবি আঁকা, মদ, সুদ, জুয়া, গান, বাজনা এবং শিয়াদের বিভিন্ন উৎসবও নিষিদ্ধ ছিল। তবে পারিবারিকভাবে হিন্দু, জৈন, পারসী বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বিরা যেমন তাদের পূজা উৎসব করতে পারতো তেমনি নাটকও মঞ্চস্থ করতো। কিন্তু ইউরোপে নাটকের চল ছিল এবং তা ছিল অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা অনুসারে। তবে ইউরোপের সমাজ তা বিপুলভাবে গ্রহণ করেনি। এমনকি শেক্সপিয়ারকেও প্রথমে তারা গ্রহণ করেনি। যদিও শেক্সপিয়ার নাটককে সুধীমহলে জনপ্রিয় করেছিলেন। শেক্সপিয়ারের পরে যিনি নাটককে জনপ্রিয়তায় অবদান রেখেছিলেন তিনি অভিনেতা ও নাট্যকার মনিয়ের।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের বেশ কয়েক বছর আগে থেকে এ দেশে ইংরেজরা তাদের আছা... মঞ্চস্থ করে আসছিল। সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ভারতবর্ষে আবার পূর্ণোদ্যমে নাট্যচর্চা শুরু হয়। নাটকের বিষয় ছিল- স্থানীয়দের নাটকে দেব-দেবী এবং ইংরেজদের শেক্সপিয়ার। উভয়ের উদ্দেশ্য তুষ্টিসাধন। দেব-দেবী, রাজার তুষ্টি এবং লোকদের তুষ্টি। তুষ্টিসাধনের সম্মানজনক শব্দ হলো বিনোদন। নাটকের যান্ত্রিক রূপ হলো চলচ্চিত্র। নৃত্য, সংগীত, মূকাভিনয়, অভিনয়, এই সবগুলোরই ধারাবাহিক সূচনা দেব-দেবীদের তুষ্টিসাধন করে তাদের আশীর্বাদপুষ্ট হওয়া। ভারত, গ্রিস ও রোম সভ্যতার সংস্কৃতির ইতিহাস তাই-ই সাক্ষ্য দেয়। অতএব সংস্কৃতি বলতে মোটাদাগে আজ যা বলা হয় নৃত্য, সংগীত ও অভিনয়। এক কথায় চলচ্চিত্রের উৎস দেব-দেবীর তুষ্টিসাধন থেকে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় নাটক। যতটুকু ইতিহাস বর্ণিত হলো তাতে প্রমাণিত হলো যে, [এক] দেব-দেবীর পূজা [দুই] নাস্তিকবাদ- এই দুটি বিষয় তরঙ্গায়িত করার জন্য নাটককে মাধ্যম করা হয়েছে। তরঙ্গায়িত করতে হলে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ দরকার সেই বিদ্যুৎ প্রবাহ নামক রস-এর উল্লেখও করা হয়েছে।

আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে আধুনিক সংস্কৃতি নামে উক্ত রসে ভরপুর সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় চলছে সর্বত্র। যার উদ্দেশ্য তুষ্টিসাধন মনোরঞ্জন বা বিনোদন। যা শিরকের চূড়ান্ত। আর এই শিরকের উদ্ভব দ্বন্দ্ব, মনোমালিন্য অধিকার হরণ, প্রতারণা, মিথ্যাচারিতা, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, নৈতিক গুণাবলির পরিবর্তে অর্থ প্রতিপত্তির মানদণ্ডের সম্মান ও আদর প্রদর্শন, জ্ঞানী ও সৎ মানুষের পরিবর্তে মূর্খ, অসৎ, মতধারী সেবা করা ও তার কাছে নত হওয়া ইত্যাদি হাজার রকম অনাচার আর জুলুমে পৃথিবী ভারাক্রান্ত ক্ষান্ত।

ইসলাম এসেছে সমস্ত রকম শিরক থেকে শিরক উদ্ভব অনাচার থেকে মানুষকে রক্ষা করে এক আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কর্মপ্রবণতার অধিকারী করতে। উক্ত রসময় সংস্কৃতির আড়ালে যে আদি রস সঞ্চিত করা হয়, তা মানুষের বিবেক থেকে ন্যায়বিচারবোধ লুপ্ত করে দেয়।

www.bjilibrary.com

কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিননাস তা'মুরুনা বিল মারুফি ওয়াতানহাওনা আনিল মুনকার ওয়াতু মিনুনা বিল্লাহি...... (আল-ইমরান : ১১০) অর্থ, এখন দুনিয়ার সেই সর্বোত্তম দল তোমরা যাদেরকে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায় ও সৎকাজের আদেশ করো, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে চলো।'

উক্ত কথাগুলো আল্লাহ তাআলা সমস্ত ঈমানদারদেরকেই বলেছেন। একজন সর্বোত্তম মানুষ যাকে হিদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে, তিনি অবশ্যই ন্যায় এবং অন্যায়ের পার্থক্য করার মত জ্ঞান রাখেন। কিন্তু আদিরসে তিনি যদি আপ্লুত হন তবে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবেন। যেমন হারিয়ে ফেলেছেন আমাদেরই চোখের সামনে প্রকাশ্যে, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, জাতীয় মর্যাদায় ভূষিত কিছু বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। স্বঘোষিত এবং যার অসংখ্য কথা, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন রচনা সাক্ষ্য দিচ্ছে তিনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন না এবং অন্যকেও বিশ্বাস করতে নিষেধ করেন। সেই নাস্তিক হুমায়ুন আজাদের কবর তারা ভার্সিটির মসজিদের পাশে দিতে বলেন। এই যে ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত এবং সত্য-মিথ্যা, বিচারবোধ তারা হারিয়ে ফেলেছেন। কেন? তা কি ঐ রসময় সংস্কৃতির অবগাহনে সৃষ্ট নয়? এটা একটাই উদাহরণ মাত্র।

মানুষের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, যা রূপরস, গন্ধ, শব্দ স্পষ্ট গ্রহণ করে বা প্রত্যক্ষ করে, এর কোন একটি ইন্দ্রিয় কর্তৃক যদি মন আল্লাহকে ভুলে গিয়ে সেই বিষয়ে আকৃষ্ট হয় তবে তার বিবেক ও বুদ্ধি লোপ পাবেই। আমাদের পাঁচটি বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তাদের অবস্থা হয়ে ওঠে শোচনীয়। আমাদের দেশের ইন্দ্রিয়সেবীরা তাই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার জন্য নিজেদের বিবেকতো কাজই করে না অন্যকে হুকুম করার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলেছে।

তাদের মাধ্যমগুলিও তারা ইন্দ্রিয়সেবার কাজে ব্যবহার করে। পানিনি, পতঞ্জলী, ভরতমুনি, অ্যারিস্টটল, শেক্সপিয়ার ও মলিয়ের এবং রবীন্দ্রনাথ তাদের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের 'মা' মৃণালিনী দেবী 'রাজা ও রাণী' নাটকে অভিনয় করেছিলেন বলে আমাদের দেশের রবীন্দ্রভক্তরা তার মারও ভক্ত হতে পারেন, কিন্তু তখনকার 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ভাশুর ভ্রাতৃবধূ স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল বলে ছি ছি করেছিল। তখনকার রাজ্যসমাজ পর্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল রবীন্দ্রনাথের মায়ের অভিনেত্রী জীবনকে।

www.bjilibrary.com

তাই বলে কি মাধ্যম হিসাবে ঈমানদাররা নাটককে ছুঁড়ে ফেলে দেবে? পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে তো আমরা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি। কলমকে ভাষাপ্রকাশের মাধ্যম, চিঠিকে খবর প্রদানের মাধ্যম, গাড়িকে যাতায়াতের মাধ্যম, অস্ত্রকে শত্রুর মুকাবিলার মাধ্যম, এইভাবে মাধ্যম হিসেবে ধারাবাহিকভাবে সব বস্তুই এসে যায়। মাধ্যমকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র করেছেন। কিন্তু কোন কোন বস্তুকে হারাম করেছেন। যেমন মাধ্যম হিসাবে গ্লাস পবিত্র, যখন পবিত্র পানি আমরা খাই। কিন্তু বস্তুটি যদি হারাম হয়? মদ হয়? তবে দুটোই অপবিত্র হয়ে যায়। একই টাকা ব্যবসা করলে তা পবিত্র, সুদ খেলে তা হারাম। একই ভাষা, গালি দেয়া হারাম, সৎকথা বলা হালাল। ঠিক তেমনি নাটক একটি মাধ্যম। জন্ম থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে হারাম কাজে। ...ভক্তরা এই মাধ্যমকে সৎকাজে ব্যবহার করবে। যদিও ভরতমুনি আর অ্যারিস্টটল যেভাবে তার সংজ্ঞা ও ব্যবহারিক নিয়ম তৈরি করেছেন, সেইভাবে কোন মুসলমান তৈরি করেননি।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে শুরু করে ভারতে মুসলিম শাসন এবং স্পেন শাসনকাল পর্যন্ত মুসলমানদের একটা সাংস্কৃতির ইতিহাস অবশ্যই আছে। যার মধ্যে হয় সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক আছে অথবা নেই- কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের সামনে স্পষ্ট নয়। আল-ফারাবির দর্শনতত্ত্ব যেমন- ইউরোপে ভিন্ন নামে তারা ব্যবহার করছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হচ্ছে, জানি না মুসলমানদের জীবন থেকে মুসলমানদের সংস্কৃতির ইতিহাস তারা তেমনিভাবে চুরি করেছে কিনা। কারণ, সম্প্রতি ইরাক যুদ্ধে তারা যেভাবে ইরাকের যাদুঘর লুণ্ঠন করেছে, তেমনি মুসলিম দেশগুলো যখন তারা উপনিবেশ করেছিল, তখন অবশ্যম্ভাবীভাবে তারা মুসলিম ঐতিহ্যকে লুণ্ঠন করেছে।

কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা- সাগর থেকে কয়েক বালতি পানি নিলেই সাগর শুকিয়ে যায় না, তা নিত্যনতুনভাবে সৃমদ্ধ। আমাদের আছে আল্লাহ তাআলার দেয়া নেয়ামত আল কোরআন। আমাদের আছে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং আরো বিপুল এক শ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠী, সাহাবা (রা.)। অতএব, আমরা সেই আদর্শকে সামনে রেখে নতুন করে নাট্যব্যাকরণ লিখবো, অভিনেতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করবো। যদিও আমাদের চেষ্টা থাকবে, আমরা যখন নির্দেশে যাই তখন আমাদের সেইসব গ্রন্থগুলিকে খুঁজে বের করা এবং তা অনুবাদ করা।

মাত্র ক'বছর পূর্বেও ইসলামী সাহিত্য বলতে আমরা নেয়ামুল কোরআন এবং মকছুদুল মুমিনুনকে বুঝতাম। এই-ই ছিল ইসলামী সাহিত্য, হাদীস ইত্যাদি। কিন্তু এখন সেদিন নেই। জাহেলিয়াতের মুকাবিলা করার মত জ্ঞান ভাণ্ডার জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য থেকে আমরা পাচ্ছি। এখনই সময় ঈমানদারদের

www.bjilibrary.com

জন্য এই 'নাটক' নামের মাধ্যমটির নতুন সংজ্ঞা এর ব্যবহার পদ্ধতি, প্রয়োগ পদ্ধতি, ব্যাকরণ এবং সঠিক ব্যবহারিক পন্থা নির্ধারণের। তার জন্য প্রথমে প্রয়োজন একটি 'গবেষণা মেলা'। নাটক রচনা, অভিনয়, নাটকের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা ও সেন্সর করা প্রসঙ্গে শরীয়ত সম্মত উপায়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

পূর্বে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আধুনিক নাটক নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শত শত নাট্যকার, অভিনেতা, নাটক নিয়ে গবেষণা করেছেন, সংজ্ঞা ঝেড়েছেন, আন্দোলন করেছেন, যার পরিণাম হেতু বর্তমান জাহেলিয়াতীয় নাটকের স্বরূপ। মুসলমানরা এই মাধ্যমটির ব্যাপারে নীরব না সরব তা স্পষ্ট নয়। কারণ আমাদের কাছে অনুবাদ সাহিত্যের বড় অভাব। শুনেছি মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ হাসানুল বান্না (র.) এর ভাই জালাল আবদুর আসসায়াতী 'সালাউদ্দীন' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু তার অনুবাদও আমাদের কাছে নেই।

জাহেলীয়তীর নাট্য ব্যবস্থা নাটকে কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করেছে। যেমন, মিলনাত্মক, ট্রাজেডী, রঙ্গাত্মক, ব্যঙ্গাত্মক, কাব্যধর্মী ইত্যাদি। কিন্তু এদের সব নাটকেরই উপাদান জাহেলিয়াতের চিন্তাধারা থেকে গৃহীত। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায়–তাদের নাটকে প্রেম আসে। একজন আর একজনকে ভালোবাসে। ভালোবাসাটার মূল কারণ অব্যক্ত থাকে। কতকগুলি কারণে ভালোবাসা জন্মে। এক. রূপ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হওয়া। দুই. কণ্ঠস্বর ও কথাবলার ভঙ্গিতে আকৃষ্ট হওয়া। তিন. ধনী বলে আকৃষ্ট হওয়া। চার. আচার-আচরণ পছন্দনীয় এবং পাঁচ যৌনতায় আকৃষ্ট হওয়া। এর সবগুলোই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির এবং ইন্দ্রিয় সুখের উপকরণে সজ্জিত। যা নিতান্তই ব্যক্তিগত কামনার প্রকাশ। কিন্তু ইসলামে ভালোবাসার মূলমন্ত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। এ ভালোবাসা সর্বজনীন এবং চিরন্তন। এক ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে তাই তুমি তাকে ভালোবাসো। ইসলামের এই মহৎ ভালোবাসার রূপ নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব। এইভাবে জাহেলিয়াতের প্রতিটি রীতি, পদ্ধতি, আবেগ, অনুভূতি, ভালোবাসা ও প্রেমজাত, সংঘাত, সংকীর্ণতা, হীনতা এবং অমানবিকতা- যাকে তারা মানবিকতা বলে–এইসবগুলেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাদেরকে বুঝানো সম্ভব। তার জন্য 'নাটক' মাধ্যমটিকে বেশ উৎকৃষ্ট মনে হয়।

তবে মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটি মাধ্যম অনৈসলামিক সমাজে শুধুমাত্র দাওয়াতি সম্প্রসারণ, মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া জাহেলিয়াতের কাহিনীনির্ভর, সময় নাটক বা চলচ্চিত্র কোনভাবেই ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।

www.bjilibrary.com

আল্লাহপাকের রহমতের বন্ধনে যে চিন্তাধারা বিকশিত হয় তাই-ই সৎ চিন্তাধারা। বন্ধনের বাইরে মুক্ত স্বাধীনতা অবারিত ঠিকই কিন্তু তা সংকীর্ণ অন্ধকার ছাড়া কিছুই নয়। অমন স্বাধীনতা আমরা চাই না, যে স্বাধীনতা মুক্ত অবারিত এবং বিকট অন্ধকারে পূর্ণ। নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতাকে সেই পবিত্র বন্ধনে বন্দী হয়ে আল্লাহপাকের রহমতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ব্যাপকতা ও বিশালতা এবং পবিত্র স্বাধীনতা তা উপলব্ধি করতে হবে। সেই বন্ধনের মাঝে অবারিত আলোক রাজ্যে অবগাহন করতে হবে।

নাটকে কাহিনী থাকবে। কিন্তু ভাবতে হবে কাহিনীটি কোন সমাজের জন্য লেখা হবে? কাহিনীতে যে চরিত্র থাকবে তারাও বা কোন সমাজের? তাদের আদর্শ কি? জাহেলীয়াতীয় সমাজের চরিত্র নিয়ে কাহিনী রচনা করে তাদের সুখ-দুঃখ তুলে ধরে দর্শকের অনুভূতি জাগ্রত করা একজন সুস্থ নীতি ও আদর্শবাদী লোকের পক্ষে শোভনীয় নয়। বরং তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেবার জন্য তৌহিদ, রিসালাত, আখেরাত এবং আল্লাহর আদেশ, নিষেধের খবর পৌছানোই বাঞ্ছনীয়। যা গবেষণার ব্যাপার এবং বেশ ব্যাপকতা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবু শুধুমাত্র আলোকপাত করে যাচ্ছি। অভিনেতার ব্যাপারে কঠোর নীতি 'আইন' আকারে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নিপুন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে চর্চার প্রয়োজন হয় একজন অভিনেতার। তাতে মন-মস্তিষ্কে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং যে মানসিকতার জন্ম হয় তা থেকে একজন অভিনেতাকে রক্ষা করে খাঁটি মুসলিম হবার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ সেল গঠন করার প্রয়োজন। অভিনয় ইন্দ্রিয় নির্ভর। যার কোন ইন্দ্রিয় অকেজো সে অভিনেতা হতে পারে না। একজন অন্ধ বা একজন বধির অভিনেতা হতে পারে না। তেমনি যার স্পর্শানুভূতি নেই সেও পারে না ভালো অভিনেতা হতে। অতএব অভিনেতা ইন্দ্রিয়ের চর্চার কারণে যাতে ইন্দ্রিয়ের গোলাম হয়ে না পড়ে, বা অহংকারী হয়ে না ওঠে অথবা কথায় বলে, 'যার শরীরে বুদ্ধি তার মাথায় বুদ্ধি থাকে না।' এমন দোষ থেকে অভিনেতাকে মুক্ত থাকার জন্য কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। যদিও ইসলামী নাটকের সংলাপ অভিনেতাকে সর্বক্ষেত্রে দোষমুক্ত থাকার জন্য সাহায্য করবে, সেটা তার বাড়তি পাওনা।

ভরতমুনির নাটক তুষ্টিসাধনের জন্য, ঈমানদারের নাটক ঈমানী তুষ্টিকে স্থায়ীকরণের জন্য এবং ঈমানী আলোকরশ্মি বিতরণের জন্য। একজন নেশাগ্রস্তের আনন্দ তার নেশার মধ্যে। ইন্দ্রিয়সুখের জন্য কোন ব্যক্তি নারীর নৃত্য-গীত উপভোগ করে, তাতে আনন্দ পায়। কেউ ঝগড়া করে আনন্দ পায় কেউ কন্ট্রাক্টরীর বিল পেয়ে বন্ধুদের মদ খাইয়ে আনন্দ পায় আবার কেউ গরীবদেরকে পেট ভরে

www.bjilibrary.com

দুটো ভাত খাইয়ে আনন্দ পায়। মানুষের আনন্দ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। তবে সবচেয়ে কুৎসিৎ, মন্দ, নিকৃষ্ট আনন্দ হলো রস সিঞ্চনে রসবর্তীদের চৌষট্টি কলার আঙ্গিকের অভিনয় আর নৃত্য এবং সংগীত। এই আনন্দ লাভ করতে গিয়ে জমিদারের পুত্র জমিদারী বিক্রি করে দেউলিয়া হয়েছে, কত রাজা রাজ্য হারা হয়েছে, কত ধনবান পথের ভিখারী হয়েছে। শেখ সাদী (র.) বলেছেন, 'বাপ বড়লোক কিন্তু ছেলের মাথা গরম'। এই উক্তিটি সম্ভবত নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যদিও তখনকার সেই সংস্কৃতির ইতিহাস আমাদের অজানা।

একজন ঈমানদার মুসলমান কখনো এমন নিকৃষ্ট আনন্দ বিতরণ করে মানুষের তুষ্টিসাধন করতে পারে না। মুসলমানের সমস্ত কাজ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য।

এই জন্যই নাটক। এই জন্যই নাটকের প্রয়োজন। মাধ্যম হিসাবে যদি নাটককে কল্যাণময় ও গঠনমূলক (একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত পথে) কাজে ব্যবহার করা যায় তবে বহুবিধ উপকার আমরা লাভ করবো। এক. ইসলামের সঠিক রূপ বিশ্লেষণ করা, দুই. জাহেলিয়াতের লেখক ও অভিনেতা তাদের নাট্যকর্মের বাইরে যে ব্যক্তি ইমেজ ব্যবহার করে অন্ধকারকে আরো ঘনিভূত করে তোলে ইসলামী নাটক রচয়িতা এবং অভিনেতা তাদের ব্যক্তি ইমেজকে ইসলামসম্মত পন্থায় বাস্তব জীবনে যখন প্রতিফলিত করবে তখন সাধারণ মানুষ ইসলামের মহত্ব এবং সঠিক রূপ কিছুটা হলেও প্রত্যক্ষ করতে পারবে বলেই বিশ্বাস করি।

বিশেষ পরামর্শ : জাহেলিয়াতের নাটক লেখক ও শিল্পীদেরকে কচি প্রাণ কিশোর-কিশোরীরা অনুসরণ করে অন্ধকার পথে ধাবিত হচ্ছে- তাদেরকে মোকাবিলা করার জন্য প্রচুর নাটক, প্রচুর অভিনয় শিল্পীর প্রয়োজন। কিন্তু শর্ত- তাকে ইমেজ সৃষ্টির পূর্বেই পূর্ণ ও খাঁটি মুসলিম হতে হবে। ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে নাটক বা চলচ্চিত্র নামের যা ইচ্ছা তাই যাতে কেউ করতে না পারে সেই জন্য এই মুহূর্তে, এক্ষুনি একটা কার্যকরী বোর্ডের মাধ্যমে নিয়ম-নীতি তৈরি করা হোক। এবং সরকারীভাবে, সেই নিয়ম-নীতি আইন-সিদ্ধ করা হোক। নতুবা একবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে নিয়মের আওতায় আনা কঠিন হয়ে পড়বে।

www.bjilibrary.com

জাহেলিয়াত চলচ্চিত্র ও ইসলামী চলচ্চিত্র সমস্যা ও সমাধান

চলচ্চিত্রের বহু 'রকম' আছে, যেমন- কাহিনীচিত্র, তথ্যচিত্র, প্রামাণ্য চিত্র, বিজ্ঞাপন চিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র.... এইসব 'রকমের' মধ্যেও শাখা-প্রশাখা আছে। কিন্তু আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই তাহলো পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের কাহিনী এবং চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ।

পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে এক একজন এক এক নামে ডেকে থাকেন.... চলচ্চিত্র, সিনেমা, বই, ছবি ইত্যাদি। পূর্বে একে 'টকি' 'মুভি' ইত্যাদিও বলা হতো। পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রেরও বেশ কিছু 'রকম' আছে, যেমন- বিনোদন ছবি, আর্ট ছবি, প্যারালাল মুভি, জীবন-ঘনিষ্ঠ ছবি ইত্যাদি। নামগুলো সাধারণত কাহিনীর গতি-প্রকৃতি ও চিত্ররূপ দেবার স্টাইলের ওপর নির্ভর করে। সেগুলোও নানা 'রকমে' বিভক্ত। তবে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো ব্যবসায়িক এবং বিনোদনের উদ্দেশ্যে যে পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র নির্মাণ করা হয়, দর্শক টিকিট কিনে সিনেমা হলে ঢুকে যে চলচ্চিত্র দেখেন, যার সময়সীমা আড়াই থেকে তিন ঘন্টা... সেই চলচ্চিত্রের কাহিনী ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে।

কাহিনী বলতে সাধারণত কোন ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনাকে বুঝানো হয়। সেই ধারাবাহিক বর্ণনার ধারাবাহিক প্রতিরূপ বা প্রতিচিত্রই হলো 'চলচ্চিত্র।' এই জন্য চলচ্চিত্রকে যারা 'বই' বলেন তারা বোধহয় ঠিকই বলেন। কারণ কাহিনীটাকেই তারা প্রধান বিষয় হিসেবে মনে করেন। কলম দিয়ে যেমন বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে কাহিনী লেখা হয়, তেমনি ক্যামেরার প্রতিটি 'শট' সাজিয়ে সাজিয়ে কাহিনী সাজানো হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি 'শট'-ই শব্দ বা বাক্যের মত।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চলচ্চিত্রের মূলভিত্তিই হলো 'কাহিনী' এবং তার গতি ও প্রকৃতি।

www.bjilibrary.com

চলচ্চিত্রের 'কাহিনী' যিনি চিন্তা-ভাবনা করে নির্মাণ করেন তাকে 'কাহিনীকার' বলা হয়। সাহিত্যবোধ, কাব্যিক রসাস্বাদনের ক্ষমতা, চিত্রনাট্য রচনা, সংলাপ প্রয়োগে শাব্দিক চাতুর্য এবং সঙ্গীত ছাড়াও ক্যামেরার দৃষ্টিভঙ্গি, তার অর্থ, আনুষঙ্গিক টেকনিক্যাল দিক আর প্রযোজনা ও পরিচালনা বিষয়ে তাকে মোটামুটি জ্ঞান রাখতে হয়। এই জন্য "কাহিনী তৈরির চেয়ে 'কাহিনী নির্মাণ' বলাটাই যুক্তিযুক্ত। আলোচ্য চলচ্চিত্র একটি পণ্য। বিপুল অর্থ ব্যয়ে, দীর্ঘ সময় ও শ্রম ক্ষেপণে তা নির্মিত হয়। সেহেতু চলচ্চিত্রের মূলভিত্তি যে কাহিনী তাকে বিনোদনের যতপ্রকার উপকরণ উপাদান আছে তা দিয়ে সাজানো হয়। যাতে বিপুল সংখ্যক দর্শক তা দেখে আনন্দ উপভোগ করে এবং নির্মাতারা তাদের লগ্নিকৃত অর্থ ফেরৎসহ মুনাফা অর্জন করতে পারেন। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে অনেক ভালো কাহিনী দুর্বল পরিচালনার কারণে নষ্ট হয়ে যায়।

সবাক ছবির ইতিহাস প্রায় পঁচাত্তর বছরের। আর এই পঁচাত্তর বছর ধরে বিজ্ঞানের আকর্ষণীয় আবিষ্কার- ক্যামেরা, লেন্স, ফিল্টার, ফিল্ম প্রজেক্টর মেশিন, সম্পাদনা যন্ত্র, শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র, ল্যাবটরীর নানাজাতীয় মেশিন এবং কেমিক্যালকে এইভাবে বিনোদনের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের অনেক পার্থক্যের মধ্যে একটি পার্থক্য হলো- টেলিভিশন ঘরে ছবি পৌঁছে দেয় আর ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে মানুষ চলচ্চিত্র দেখে। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ধরে একটা বদ্ধ অন্ধকার ঘরে বসে ছবি দেখা... পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা, চিন্তা-ভাবনা এবং কাজকর্মকে বিদায় জানিয়ে একান্ত নিজের ভুবনে থেকে একটি কাহিনী উপভোগ করা... সে একটা ভিন্ন ব্যাপার, যেন ভিন্ন জগৎ। যে চলচ্চিত্রটির কাহিনীর ভাঁজে ভাঁজে দর্শকের চাহিদার খোরাক আছে সেই চলচ্চিত্রটিই সাফল্য লাভ করে।

দর্শকের চাহিদা জানতে হলে দর্শকের সঙ্গে কাহিনীকারের একটা সংযোগ থাকতে হয়। সেই সংযোগের ভিত্তিতেই কাহিনীকার একটা কাহিনী চিন্তা করেন, কল্পনায় সেই কাহিনীকে ধারাবাহিক চিত্রনাট্যে সাজিয়ে মোটামুটি ড্যামি সংলাপসহ প্রথমে হৃদয়ের পর্দায় দেখে থাকেন। তিনি অনুভব করেন তার চিন্তার ফসল দর্শককে আন্দোলিত করছে, আবেগতাড়িত করছে, উত্তেজিত করছে, দর্শক উপভোগ করছে- তিনিও যেন দর্শক হয়ে যান মুহূর্তে মুহূর্তে... এবং তারপর কাহিনীটাকে তিনি চলচ্চিত্র উপযোগী করে লিখতে শুরু করেন ।

যেসব পটভূমিতে কাহিনী নির্মাণ করা হয় তাকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

১. ধর্মীয় কাহিনী । ২. সামাজিক কাহিনী । ৩. রাজনৈতিক ও

৪. পোশাকী কাহিনী ।

www.bjilibrary.com

এছাড়া ইউরোপ আমেরিকায় ওয়েস্টার্ন, সাইন্স ফিকশন, ভৌতিক এবং এ্যানিমেশন জাতীয় ফিল্ম তৈরি হয় যা নিতান্তই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর।

১. **ধর্মীয় কাহিনী :** যদিও ধর্মীয় কাহিনী নিয়ে উপমহাদেশে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়েছিল, তবে ধীরে ধীরে তার নির্মাণ কমে যায়। এখনো ভারতে বিভিন্ন ভাষায় ধর্মীয় কাহিনী নিয়ে নিয়মিত ছবি নির্মিত হয়। সেসব কাহিনী সাধারণত মহাভারত অবলম্বনে নির্মিত হয়। ধর্মীয় মহাপুরুষদের জীবনীভিত্তিক ছবিও সেখানে নির্মিত হয়। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীও যথেষ্ট সমাদৃত। আরব দেশে, বিশেষ করে মিশর ও ইরানে জীবনীভিত্তিক ধর্মীয় ছবি তৈরি হয়েছে। সেখানে সে বিষয়ে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বিশেষ করে বর্তমানে ইসলামের বিশিষ্ট সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব, তাদের কর্মধারা, যুদ্ধ এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বিষয়ে ছবি নির্মাণের পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করছে।

২. **সামাজিক কাহিনী :** সামাজিক কাহিনীকে আমরা চারটি রূপে দেখতে পাই।

এক. পারিবারিক দ্বন্দ্ব সংঘাত।

দুই. প্রেম ও সঙ্গীতাশ্রয়ী ।

তিন. লোকগাঁথা (প্রেম ও সঙ্গীতাশ্রয়ী)। চার. মারদাঙ্গা।

৩. **রাজনৈতিক কাহিনী :** রাজনৈতিক কাহিনীকে তিনটি রূপে চলচ্চিত্রে দেখানো হয়।

এক. জীবনধর্মী (ইতিহাস)

দুই. যুদ্ধ-বিগ্রহ।

তিন. কোন মতবাদ বা রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার।

৪. **পোশাকী কাহিনী :** পোশাকী কাহিনী সাধারণত কাল্পনিক, রাজা- বাদশাহ, যাদু, রাক্ষস, তাদের প্রেম-সংঘাত, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি উপকরণে সজ্জিত।

আমাদের দেশে সাধারণত সব ধরনের ছবি মাঝে মাঝে নির্মিত হলেও সামাজিক কাহিনী নিয়ে ছবি নির্মিত হয় নিয়মিত।

১৯৯৫ সাল পর্যন্ত চলচ্চিত্রের কাহিনী নির্মিত হতো মধ্যবিত্ত পরিবারের দর্শকদেরকে টার্গেট করে। পরিবারের অনেকেই একসঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখতে যেতো। সেসব ছবির কাহিনীতে পারিবারিক দ্বন্দ্ব, সমস্যা ও নাটকীয়তা থাকতো। তাছাড়া কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন বয়সের চরিত্র থাকতো। দাদা-দাদী, নানা-নানী, ফুফা-ফুপু, মামা-মামী ইত্যাদি চরিত্রগুলোকে খুব আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করা হতো। এসব চরিত্রের কৃপণতা-উদারতা, মায়া-মমতা, ক্ষমাশীলতা, ভালো-মন্দ, কৃপণতা-উদারতা, মায়া-মমতা, ক্ষমাশীলতা, উন্নাসিকতা,

www.bjilibrary.com

প্রতিশোধ পরায়ণতা ইত্যাদি দোষ-গুণকে যথাসম্ভব আবেগময় ও রসময় করে উপস্থিত করা হতো। দর্শক তা পছন্দ করতো। সেসব কাহিনীতে কাহিনীকার প্রেম নিয়ে আসতেন বেশ নিয়ন্ত্রিত উপায়ে। প্রেমিক-প্রেমিকার লজ্জা, ভয়, বিনয়, সংকোচ ও শালীনতাও যথাসম্ভব রক্ষা করা হতো। তাদের প্রেমের সংলাপও ছিল মার্জিত এবং নিয়ন্ত্রিত। মোটকথা তখনকার কাহিনীতে যৌনতাহীন প্রেম তৈরি হতো। প্রতিশোধ থাকতো কিন্তু হিংস্রতা থাকতো না।

১৯৯৬ সালে রাজনৈতিক ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর চলচ্চিত্রের কাহিনীরও পটপরিবর্তিত হয়ে যায়। পরিবর্তিত হয় কাহিনীর ভাঁজে ভাঁজে উপকরণ উপাদানের। যৌনতাহীন প্রেমের পরিবর্তে আসে প্রেমহীন যৌনতা। হিংস্রতা, পশুত্ব, উলঙ্গতা, অশ্লীলতা, লজ্জাহীনতা ছবির কাহিনীতে ভরপুর হতে থাকে। মধ্যবিত্ত পরিবার ছবি দেখা ছেড়ে দেয়। রাজনৈতিক দলের ক্যাডারদের হাতে আসে কাঁচাটাকা। তারা হয় সিনেমার দর্শক এবং এসময় কোন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই দেশে বিভিন্ন পতিতালয়গুলিতে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। আর শহরের বসতি এলাকায় তারা বাসা ভাড়া নিতে শুরু করে। চলচ্চিত্রের কাহিনীও তার রূপ বদলে অশ্লীল নাচ-গানে ভরপুর হতে থাকে। কারণ একটি পণ্য ভোক্তাদের চাহিদার মাপকাঠিতেই উৎপাদিত হয়। তার বিপরীত হলে সেটি আর পণ্য থাকে না। তার উৎপাদনই বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে রাজনৈতিক কূটচালে একশ্রেণীর দর্শককে অশ্লীল ছবি দেখিয়ে উদ্দীপ্ত করে ব্যভিচারের পথ সুগম করে দেয়া হয়। অনেকে বলে থাকেন চলচ্চিত্রের কারণেই সমাজে অশ্লীলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বেহায়াপনা এবং উলঙ্গপনা প্রসার লাভ করে। কিন্তু তারা যদি একটু ভাবতেন, চলচ্চিত্র সৃষ্টির পূর্বেও সমাজে যৌনতা, অশ্লীলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল এবং গৃহকর্তা নিজে যদি এইসব দোষকে দোষ মনে না করেন বরং অবাধ ও ন্যায় মনে করেন তবে পরিবারের অতি বড় চরিত্রবানও চরিত্র হারিয়ে ফেলবেন।

মুসলমানরা ভারতবর্ষে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার পূর্বক্ষণে ভারতবর্ষের শাসকদের মধ্যে উক্ত দোষগুলি প্রকটভাবে বাসা বেঁধেছিল, পক্ষান্তরে মুসলমানরা ছিল উক্ত দোষমুক্ত। তদ্রূপ ইংরেজরা ভারতবর্ষে শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পূর্বক্ষণে উক্ত দোষ মুসলমান শাসকদের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। মনে রাখতে হবে উক্ত দোষগুলি মানুষকে ক্রোধান্ধ করে, তাতে মনে হয় মানুষগুলো বীর ও সাহসী। কিন্তু ক্রোধান্ধ মানুষই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তারা বীর ও সাহসী তো নয়ই বরং তারা সাপের মত, ভয় পেলেই ছোবল মারে, তারা ভীতু ও কাপুরুষ। তারা তাদের গঠনমূলক সৃজনশীল বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় চলে বলে পরাজিত হয়।

www.bjilibrary.com

চলচ্চিত্রকে যে যে কারণে দোষারোপ করা উচিত তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। সে ব্যাপারে আলোচনার পূর্বে কিছু প্রারম্ভিক আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

কাহিনীকার কিভাবে দর্শকের চাহিদা পূরণ করতে চেষ্টা করেন, তিনি কিভাবে বুঝতে পারেন দর্শক কি চাচ্ছে? চলচ্চিত্রের কোন কাহিনী যখন চলচ্চিত্র হয়ে দর্শকের সামনে আসে কেবল তখনই বুঝতে পারা যায় দর্শক কি চায় বা চায় না। এর পূর্বে এ বিষয়ে ধারণা করা অসম্ভব। দর্শকের সামনে আসার পূর্বে পৃথিবীর কোন কাহিনীকারই বলতে পারেন না তার কাহিনীকে দর্শক গ্রহণ করে নেবে কিনা।

ভারত উপমহাদেশে নির্বাক যুগে এবং সবাক যুগের কয়েক বছর হিন্দু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ধর্মীয় ব্যক্তির জীবনীভিত্তিক কাহিনীর আলোকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হতো। হলিউডের চলচ্চিত্রেই উপমহাদেশের ছবির কাহিনীর পটভূমি বদলে দেয়। তৈরি হতে থাকে সাহিত্যভিত্তিক সামাজিক ছবি এবং সঙ্গীতাশ্রয়ী ছবি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত যত প্রকার কাহিনী নিয়ে ছবি হয়েছে, সেসব ছবিকে দর্শকরা গ্রহণ করেছে কি করেনি, গ্রহণ করলে কি কি উপাদান বা উপকরণগুলো গ্রহণ করেছে এসব বিষয়ে কিছু কিছু চর্চা ভারতের বম্বে ও চিন্নাইতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে চর্চা করার মত ধৈর্য, সময়, পরিবেশ ও মানসিকতা আমাদের কাহিনীকারদের নেই বললেই চলে এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাগোষ্ঠী বা তেমন কোন সামাজিক সংগঠনও নেই যারা এ বিষয়ে গবেষণা করবে।

তবে চলচ্চিত্র কাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সবটাই আমাদের দেশে গ্রহণ করা হয়। শুধুমাত্র কাহিনী নকল করার সময় ভারতীয় ছবির কাহিনীর মধ্যে যেখানে পূজা-অর্চনা আছে সেটুকু বদলে সেখানে নামাজ বা মুনাজাত ঢুকানো হয়। যদিও ভারতীয় হিন্দী ছবির পুরো অবয়ব জুড়ে ভারতবর্ষের শাশ্বত হিন্দুত্বের রূপের বদলে জড় ও নাস্তিক্যবাদের রূপই প্রকট। আশির দশক থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্র থেকে হিন্দু মূল্যবোধের সঙ্গে জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদ এবং ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণ প্রত্যক্ষ করা যায়।

আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের সঙ্গে উক্ত মূল্যবোধের কোন পার্থক্য তো নেই-ই বরং মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তবুও আমাদের দেশের দর্শকদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ থাকার কারণে ভারতীয় ছবির নকলকৃত অংশের বহু উপাদান ও উপকরণ দর্শক গ্রহণ করে না বিধায় অনেক নকল ছবি দর্শক-আনুকূল্য পায় না। তাই বুদ্ধিমান কাহিনীকাররা দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ রাখার চেষ্টা করেন। আর দর্শকদের চাহিদা যতটুকু সংগ্রহ করতে পারেন তারই আলোকে কাহিনী সাজান এবং ভারতীয় কাহিনীর নকলকৃত অংশ থেকে কাটছাঁট করেন।

www.bjilibrary.com

কাহিনীকারদের সঙ্গে দর্শকদের সংযোগের মাধ্যম হলো তিনটি-

এক.

ভি.সি.ডি। (অনেকে চিন্নাই ও বম্বে গিয়ে নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত সুপার হিট ছবি সিনেমা হলে বসে রেকর্ড করে নিয়ে আসেন।) এই সব ভারতীয় ছবির কাহিনীর ভিতরে "টার্নিং পয়েন্ট" থাকে। এই টার্নিং পয়েন্টগুলোই শুধু চুরি করা হয়। বাকি থাকে কাহিনীর প্রকৃতি ও গতি অন্য কোন ছবি থেকে তা নেয়া হয় অথবা খুব কমক্ষেত্রে নিজস্ব মৌলিক চিন্তাধারায় সাজানো হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভি.সি.ডি-র মাধ্যমে বিভিন্ন ছবি দেখে 'মিল খায়' এসব ধরনের ভাবধারাগুলো একাধিক ছবির গল্প থেকে নেয়া হয়। যেসব কাহিনীর মধ্যে টার্নিং পয়েন্ট' বেশি থাকে প্রাথমিকভাবে সে কাহিনীকেই সুপার হিট বলে ধারণা করা হয়। 'টার্নিং পয়েন্ট' হলো তাই, যা এমন একটা ঘটনা- হৃদয়বিদারক, রহস্যে ঘেরা, আবেগময় এবং যে ঘটনা ঘটলে চলে আসা চরিত্রগুলো ভিন্ন আঙ্গিকে চলতে শুরু করে। এক কথায় কাহিনীর গতানুগতিক প্রবাহকে ভিন্ন পথে মোড় ঘুরিয়ে দেয়া।

দুই.

চলচ্চিত্র জগতের যারা তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমিক ও কর্মচারী- যেমন প্রোডাকশন বয়, মেক-আপ এ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রোডাকশনের মালামাল সাপ্লায়ারদের কর্মচারী, কুলি মুজুর, অফিসের পিয়ন- এদের কাছ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির কাহিনীর টার্নিং পয়েন্ট, উপাদান, উপকরণ, গ্রহণ-বর্জন ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। কাহিনী বলার সময় এদের আবেগকে মূল্য দেয়া হয়। এদের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কাহিনী তৈরি করা হয়। এর কারণ হলো, আমাদের দেশে যাদেরকে দর্শক হিসেবে টার্গেট করে কাহিনী নির্মিত হয়, চলচ্চিত্রের এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদেরকেই তাদের প্রতিনিধি মনে করা হয়। এদের পছন্দ-অপছন্দ, এদের রাগ-দুঃখ, হিংসা-বিদ্বেষ, এদের আবেগ-অনুভূতি উক্ত টার্গেটভুক্ত দর্শকদের মনস্তাত্ত্বিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যতা রাখে।

শুধু কাহিনীকার নয়, এই মাধ্যমগুলিকে পরিচালক, প্রযোজক এবং শিল্পীরাও ব্যবহার করে থাকেন এবং এদের ওপরই কাহিনীর সাফল্যের জন্য তাদের বিশ্বাসকে শাণিত করার সুযোগ নেন।

তিন.

সর্বশেষ সংযোগ মাধ্যম হলো যার যার পারিবারিক সদস্য, চলচ্চিত্রের থার্ড পার্টি বুকার ও চলচ্চিত্র সাংবাদিকবৃন্দ। এরা যেমন মাধ্যম তেমনি কাহিনীর সফলতার জন্য বিশ্বস্ত মন্তব্যকারী। এদের মন্তব্য কাহিনী নির্মাণের বিশ্বাসকে পোক্ত করে দেয় অথবা পরিত্যাগ করতে প্রেরণা যোগায়।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য যে কাহিনী- তা যথাযথভাবে উদ্ভাবন ও নির্মাণের জন্য উক্ত তিনটি মাধ্যমই একমাত্র মাধ্যম। পাকিস্তান আমলের চব্বিশ বছর এবং স্বাধীন বাংলাদেশের তেত্রিশ বছর, মোট সাতান্ন বছর ধরে উক্ত নিয়মের অধীনে চলচ্চিত্রের কাহিনী নির্মিত হয়ে আসছে। এর বাইরে সাহিত্যধর্মী চলচ্চিত্র, বিকল্পধারা, পরীক্ষা-নিরীক্ষাধর্মী কাহিনী ও তার বিষয়বস্তু একটা বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন অধ্যায় হেতু সে প্রসঙ্গে আমরা আলোচনায় যাচ্ছি না। গত পঁচাত্তর বছর ধরে ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের কাহিনীর পটভূমি, সংঘাত, দ্বন্দ্ব এবং চরিত্রগুলির রঙ, রূপ ও রসবোধ একই রকম কেন! আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম- কাহিনীর একই মূল সুর ও উপভোগের মানসিকতা একই ধাঁচের কেন!

বিশ্লেষণে মোটামুটি নিম্নলিখিত কারণগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে-

১. শাসক শ্রেণী এবং তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে সম্পর্ক তা মূলত শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের সম্পর্ক। এর মানদণ্ড হলো দেশের বিচার ব্যবস্থা। একই অপরাধের কারণে একজন সাধারণ মানুষের যে শাস্তি হয় একজন সরকারি প্রতিনিধির সে শাস্তি হয় না।

অন্যদিকে নির্যাতিত সাধারণ দরিদ্র শ্রেণী বিচারের দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, কারণ বিচারের দারস্থ হওয়া খরচসাপেক্ষ, যা বহন করার যোগ্যতা বা ক্ষমতা সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর নেই। দ্বিতীয়তঃ বিচার প্রার্থীকে অনেক হয়রানিমূলক সরকারি প্রতিনিধির মুখোমুখি হতে হয়। তাই সাধারণ মানুষ যুগের পর যুগ ধরে বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে বিধায় একটা ক্ষোভ, বিতৃষ্ণা, প্রতিশোধস্পৃহা স্বভাবতই শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে দানা বেঁধে থাকে। (বৃটিশরা বুদ্ধিমান জাতি, তারা এদেশের শাসন ক্ষমতা লাভের পরপরই অন্য কোন দিকের পরিবর্তন না এনে সর্বপ্রথম বিচারব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে তাদের স্বার্থসম্মত করে প্রতিষ্ঠা করেছিল।)

তাই চলচ্চিত্রের কাহিনীকাররা কাহিনীর পটভূমি হিসেবে শাসক শ্রেণীর প্রতিভু হিসেবে কিছু ধনী, সবল শ্রেণী তৈরি করেন। তাদের দ্বারা শোষণ, নির্যাতন এবং অত্যাচার করানো হয় বিপরীত পক্ষ দরিদ্র শ্রেণীর ওপর। দরিদ্র শ্রেণীর একজন কাল্পনিক স্বপ্নময় পুরুষ দাঁড় করানো হয়, সে প্রতিবাদ করে এবং শেষমেষ শোষক অত্যাচারী শ্রেণীকে ধ্বংস করে দেয় এবং তিনিই নায়ক।

অথবা যদি প্রেমের কাহিনী নির্মাণ করা হয় তবে বড়লোক শ্রেণীর মেয়ে এবং দরিদ্র শ্রেণীর ছেলে অথবা এর উল্টোটা কাহিনীর মূল চরিত্র হিসেবে তৈরি করা হয় এবং এদের দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং প্রতিঘাতের মাধ্যমে বড়লোক বা ধনী শ্রেণীকে পরাজিত করে, দরিদ্র শ্রেণীর কাছে মাফ চাওয়ার মাধ্যমে কাহিনীর সমাপ্তি হয়।

www.bjilibrary.com

এই উপমহাদেশের বেশির ভাগ চলচ্চিত্রের কাহিনী এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মাণ করে সফলতা পেয়েছে।

২. মানুষের সমস্যার যেমন বিভিন্ন আঙ্গিক রয়েছে তেমনি তার সমাধানেরও বিভিন্ন পথ আছে। সেসব আঙ্গিক ও পথের অজস্র শাখাপথের ঘূর্ণিপাক আছে। মানুষ তার ব্যক্তিজীবনে সেই ঘূর্ণিপাকের মধ্যে থেকে যার যার মত করে সমস্যার সমাধান করে। এসব সূক্ষ্ম চিন্তাধারায় একজনের সঙ্গে আর একজনের চিন্তার দ্বিমত থাকতে পারে। তাই যাতে কোন দ্বিমত নেই সেই সব মোটা ও স্থূল দাগের আবেগকে কাহিনীতে গ্রথিত করা হয়। আবেগের মধ্যে প্রেমাবেগই মোটা ও স্থূল, যার রূপ, রস ও রঙ সাধারণ মানুষের কাছে একই আবেদন সৃষ্টি করে। এই কারণে সব কাহিনীতেই প্রেমের আবেগ সৃষ্টি করা হয় এবং এতে কোন ঝুঁকি থাকে না। অর্থ খরচ করে দর্শক কোন জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে চায় না বলেই উক্ত স্থূল দৃষ্টিভঙ্গিতে কাহিনী নির্মাণ করা হয়। নির্মাতাও কোন অর্থনৈতিক ঝুঁকির মধ্যে যেতে চায়।

৩. শোক, দুঃখ ও যন্ত্রণা মানুষের নিত্য সঙ্গী। তবে এসবের অজস্র সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। যা একান্তই মনস্তাত্ত্বিক এবং জটিল। আর তার মাঝেও বিভিন্ন মত ও পথ সংযুক্ত। তাই সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় না গিয়ে মোট, স্থূলভাবে শোক, দুঃখ ও যন্ত্রণাকে কাহিনীতে সন্নিবেশিত করা হয়। পঁচাত্তর বছর ধরে কাহিনীকার, পরিচালক ও প্রযোজক এইভাবে একই আঙ্গিকের কাহিনীর ওপর চলচ্চিত্র উৎপাদন করে আসছে এবং দর্শক তা দেখছে। ধনী-গরিব তথা শোষক-শোষিত, অত্যাচারী-অত্যাচারিত (চলচ্চিত্রের কাহিনীতে একই সমার্থক বোধক শব্দ) - এদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রেমাবেগ এবং শোক দুঃখ আর তার দ্বারা সৃষ্ট নাটকীয়তা নিয়েই সমস্ত কাহিনী নির্মাণ হয় বরং বলা যায় এগুলোকেই কাহিনী বলে।

অনেকে বলেন, এসবই সার্বজনীন। নায়ক যখন বলে, "আমার বাবা-মাকে তালুকদার হত্যা করেছে, আমি এর প্রতিশোধ নেব-" এটা শুধু নায়কের কথা নয় বরং যারা এ জাতীয় অন্যায়ের শিকার তাদের সবার কথা, তাই এটা সার্বজনীন। উক্ত নায়ক ঐ সমস্ত নির্যাতিতের প্রতিনিধি। অন্যদিকে তালুকদার অত্যাচারী, খুনি, এরকম তালুকদার শাসক শ্রেণীর মধ্যে লক্ষ লক্ষ আছে, তাই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হিসেবে প্রতীকী স্বরূপ তালুকদারকে হত্যা করা বা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটা সার্বজনীন।

কোন চিরন্তন মানবকল্যাণের শাশ্বত আদর্শের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সেই আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্য যা কিছু করা হয় সেটাই সার্বজনীন। সেই আদর্শ রক্ষার জন্য যদি পিতা সন্তানকে হত্যা করে সেইটাই সার্বজনীন। কিন্তু কোন

www.bjilibrary.com

ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তি আবেগ-অনুভূতিকে জয়লাভ করাবার জন্য যদি সামান্য অথবা ব্যাপক কোন লাভ-লোকসান হয় তা সার্বজনীনের মর্যাদা পেতে পারে না।

ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা এবং বিপরীত দিকে শোষিতের প্রতিশোধ নেয়া এসবই জাহেলিয়াতের নামান্তর। বরং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ীকরণের জন্য হত্যা করা, নির্যাতন করা থেকে মানুষকে যে জিনিসটি নিবৃত করে তাই-ই আদর্শ এবং সার্বজনীন। সার্বজনীন তাকেই বলে যা অত্যাচারী ও অত্যাচারিতকে কল্যাণের পথ দেখায়। ঘাত এবং প্রতিঘাত ধ্বংস ডেকে আনে। কিন্তু এমন কিছু অবশ্যই আছে বা থাকা উচিত যা অনুসরণ করলে না ঘাত থাকে না থাকে প্রতিঘাত। ধ্বংসের স্থলে সৃষ্টির উন্মাদনা আসে, কল্যাণ বর্ষিত হয়। একটি সত্যিকার আদর্শই হচ্ছে সেই সার্বজনীনতা। যাকে সার্বজনীন বলা হচ্ছে তা সার্বজনীন নয় । আর যা সার্বজনীন নয় তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। আর যা কল্যাণময় ও সার্বজনীন তাকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে বস্তুগত স্বার্থ, ব্যক্তিস্বার্থ, নাস্তিক্যবাদ ও জড়বাদী মন্ত্র এবং সেই আদর্শ উদ্ভূত ক্ষমতালাভ ও স্থায়ীকরণের কারণে।

চলচ্চিত্রের কাহিনীতে আসলে কোন সার্বজনীনতা নেই বা থাকে না। বরং সেখানে প্রবলভাবে উপস্থিত শাসক চরিত্র। কাহিনীতে শোষক ও অত্যাচারী, শোষিত ও অত্যাচারিত এই উভয় চরিত্রেই শাসকের ভোগবাদ ও ক্ষমতা স্থায়ীকরণের মানসিকতা প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত হয় শাসকশ্রেণীর বিচার পদ্ধতির স্বরূপ। বরং বলা যায় উভয় চরিত্রই শাসকচক্রের বিচার পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত। যেমন একজন চাঁদাবাজের গুলিতে নায়কের বাবা-মারা গেল। নায়ক পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল। এক্ষেত্রে নায়কের চরিত্র নিয়ে কাহিনী এগিয়ে যায়, তার অসহায়ত্ব, তার বিচার না পাওয়া, উজ্জ্বল শিক্ষা-জীবনটা নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে কাহিনী গন্তব্যের দিকে ধাবমান হয়। অন্যদিকে যদি হাইজ্যাকারকে নিয়ে কাহিনী এগিয়ে যেত, তবে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াতো যে, তার হাইজ্যাক করার স্পৃহা, জেগেছে বিনা অপরাধে শাস্তির বিধান জারি হবার কারণে, দুঃখ যন্ত্রণায় অনাহারে থেকে বিধবা মাকে বাঁচাবার জন্য হাইজ্যাকের সাহস পেয়েছে, কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তি শর্তসাপেক্ষে তাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবার আশ্বাস দিয়েছে, ইত্যাদি। সবকিছুর মূল শিকড় শাসকচক্রের বিচারব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরা উভয়ে ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা এবং উদ্ধারে ব্যস্ত। অন্যায়ের শিকার ও অন্যায়কারী উভয়ে কোন আদর্শ ব্যতীত কার্য সম্পাদন করছে। শাসক চরিত্র ঠিক এমনি পন্থায় যুক্তি তৈরি করে অন্যায়কে ন্যায় হিসেবে প্রমাণ করে। কারণ কোন নির্দিষ্ট আদর্শের ভিত সেখানে অনুপস্থিত। যে আদর্শটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে তুমি যেই হও তুমি এই আদর্শের মাপকাঠিতে অন্যায় করেছ, তোমার দণ্ড অবধারিত।

www.bjilibrary.com

চলচ্চিত্রের কাহিনী তাই আদর্শ বিবর্জিত শাসকচক্রের চেহারার আয়নাস্বরূপ। এরা কখনো আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে না। লড়াই করে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাই গত পঁচাত্তর বছর ধরে এ উপমহাদেশের সব চলচ্চিত্রের কাহিনীর মর্মরূপ একই। শাসকচক্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদের বিচার পদ্ধতি, তাদের আদর্শহীন ক্ষমতা প্রয়োগের রীতি জনগণের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। চলচ্চিত্রের কাহিনীতে সেই চিত্রই নানা আঙ্গিকে ফুটে ওঠে। আর সেই চরিত্রের সঙ্গে কোন শালীন ও সুস্থ সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ থাকে না। যেমন চলচ্চিত্রের কাহিনীতে ভার্সিটিতে পড়ুয়া খল-নায়ক ছেলেটির শরীরে এক ধরনের জাকেট, গলায় স্টিলের চেইন, চুলগুলো অমার্জিতভাবে ঝাঁকড়া, চোখে বিসদৃশ বাটের সানগ্লাস ইত্যাদি অনায়াসে মানিয়ে যায়।

অথচ যে ছেলেটিকে পড়ুয়া, আদর্শ, চরিত্রবান, সৎ দেখানো হয়, সেই নায়কের পরনে থাকে শালীন পোশাক। ঠিক তেমনি শাসকচক্রের মানানসই রূপটি ফুটে ওঠে চলচ্চিত্রের কাহিনীতে। আর সে কাহিনীর পোশাক হলো যৌনতা, অশ্লীলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা অশ্লীল সংলাপ এবং অশ্লীল অসত্য অঙ্গভঙ্গি। ক্ষমতার পট পরিবর্তন হলেও যেহেতু আদর্শ ও নীতির পরিবর্তন হয় না, শুধুমাত্র শাসকচক্রের চেহারার পরিবর্তন হয় কিন্তু রীতিনীতি সব। একই থাকে তাই চলচ্চিত্রের কাহিনীতেও কোন পরিবর্তন হয় না- শুধু কাহিনীকার, পরিচালক, শিল্পী ইত্যাদি পরিবর্তন হয়। শাসকচক্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রকার মাধ্যমগুলোর ওপর প্রতিফলিত হয়। আর মাধ্যমগুলো কোটি কোটি জনগণের মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রও একটি মাধ্যম, আর চলচ্চিত্রের কাহিনীকার মূল ভূমিকা পালন করে থাকেন। একটি চলচ্চিত্রের মূলভিত্তি প্রস্তর তিনিই স্থাপন করে থাকেন।

কাহিনীকার যখন কাহিনীর পটভূমি, চরিত্র এবং ঘটনাবলী চিন্তা করে । তখন তার মন-মস্তিষ্ক সার্বক্ষণিকভাবে তাতেই ডুবে থাকে। কাহিনীর মধ্যে সংঘাত, দ্বন্দ্ব, টেনশন সৃষ্টি করা, প্রেম, সঙ্গীত, রোমান্স ও নাটকীয়তা দিয়ে পুরো কাহিনী সাজানো- এসব অবশ্যই ভাবনার বিষয়। কাহিনীর প্রতিটি ঘটনা, চরিত্র ও তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত সবই ব্যক্তিস্বার্থকে কেন্দ্র করে, তাতে নিচুতা, শঠতা, নিষ্ঠুরতা, প্রভুত্ব প্রিয়তা, বিদ্যমান এবং বিশেষ একটা শ্রেণীর দর্শকদের মানসিক চাহিদা পূরণ করা, তাদের পছন্দের খোরাক জোগান- তারা যা চায়, তাদের যে ধ্যান-ধারণা চিন্তা-চেতনা যা শাসকচক্রের নীতির আলোকে তৈরি হয়েছে, তাকে সমর্থন করা একজন কাহিনীকারের কাজ। একে আত্মবিক্রয় বলে। বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী তাদের পণ্য বিক্রি করে- কিন্তু সেখানে আত্মবিক্রয় প্রশ্নটা আসে না, কারণ সেসব পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় এমন একটা ব্যবসা যাতে

www.bjilibrary.com

মানুষ উপকৃত হয় এবং সর্বস্তরের মানুষই তা ব্যবহার করতে পারে। তাতে শরীর ও স্বাস্থ্য উপকৃত হয়। নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন মিটায়, আর এসব প্রয়োজন সুষ্ঠুভাবে মিটলেই মানুষ প্রশান্তি লাভ করে, পণ্যটির প্রশংসা করে।

কিন্তু চলচ্চিত্র এমন একটি পণ্য যার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে ভোক্তাদের শারীরিক বা ব্যবহারিক উপকার নেই বরং একশ্রেণীর মানুষ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আনন্দ উপভোগ করে। আর আনন্দ ব্যাপারটা যেহেতু মনস্তাত্ত্বিক, সেহেতু মানসিক গতিধারার অবস্থান, তার প্রবাহ, প্রকাশের রূপ তার পরিবর্তন, তার আবেগ-অনুভূতি, সহ্যক্ষমতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে সঠিক কোন অনুশীলন, গবেষণা বা চর্চা নেই বলেই কোন আনন্দের কতটুকু ক্ষতিকারক ও বিধ্বংসকারী প্রভাব সে বিষয়ে আমরা অন্ধ।

অত্যন্ত চিন্তাভাবনা করে, যত্নের সঙ্গে সাজিয়ে গুজিয়ে, প্রতিটি সিনের পরতে পরতে যিনি আনন্দের প্রতিটি উপাদান ও উপকরণের জোগান দেন, তার মানসিক চিন্তাধারা অবস্থান ও রূপ পর্যালোচনা করলে। দর্শকরা কি ধরনের আনন্দ পায় এবং সেই আনন্দ তাদের ধ্যান-ধারণাকে সতেজ করে না দুর্বল করে অথবা কি ধরনের ছাপ ফেলে তার একটা আভাস আমরা পেতে পারি ।

একটা কাহিনীকে যা দিয়ে সাজানো হয় তা হচ্ছে অবৈধ প্রেম, অবৈধ যৌনস্পৃহা এবং অশ্লীলতা। আর এসব অনৈতিক কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত নির্দয়তা ও হিংস্রতা। এসব অসৎ বৃত্তিগুলোর অসংখ্য শাখা পথ আছে, যেমন ভিলেন নায়ককে খুন করতে চায়, কিন্তু কিভাবে খুন করবে! সিনেমার পর্দায় একভাবে খুন করতে দেখে দর্শক, কিন্তু কাহিনীকারকে উক্ত খুন করার স্টাইলটাকে অসংখ্য ধরনের ভাবতে হয়। শেষ পর্যন্ত যে স্টাইলটাকে উক্ত ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত এবং মানানসই মনে হয় সেই চিন্তাটাকেই চিত্ররূপ দেয়া হয়। অপরদিকে প্রেম এবং অশ্লীলতার ক্ষেত্রেও ঐ একই পদ্ধতিতে ভাবতে হয়। ভাবনাগুলো মন থেকে আবার এমনি এমনি উদয় হয় না, ঘরে-বাইরে, টি.ভি পর্দায়, ভি.সি.ডিতে, মাঠেঘাটে, বাজারে সবস্থানেই কাহিনীকারকে (সংশ্লিষ্ট সবাই, বিশেষ করে প্রযোজক, পরিচালক এবং প্রধান শিল্পীরা, এমনকি প্রোডাকশন ম্যানেজার, ড্রেসম্যান, মেক-আপম্যান পর্যন্ত) চোখ ও মন-মস্তিষ্ক সক্রিয় রেখে সংগ্রহ করতে হয় ঐ সব অনৈতিক কার্যকলাপের ধরন এবং উপাদান-উপকরণ।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, কাহিনীর অন্যান্য আবেগপ্রবণ দিকগুলো দর্শকরা তাৎক্ষণিকভাবে উপভোগ করলেও অবৈধ প্রেম ও অশ্লীল দৃশ্যগুলো দর্শকের মন-মানসিকতায় দীর্ঘ সময় ধরে ক্রিয়া করে। তাই ঐসব দৃশ্যগুলো প্রথমে কাহিনীর মধ্যে কাহিনীর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় এমন ধরনের উপাদান ও উপকরণে সজ্জিত করতে হয়।

www.bjilibrary.com

যে কারণে একজন কাহিনীকারকে সমাজ সংসার, মানুষ, দেশ ও পৃথিবীর ব্যাপকতার মধ্যে হাজারো কল্যাণ-অকল্যাণের দিক, সমস্যা, সংঘাত, জটিলতা, মানবিকতা, সেবা এবং এতসংক্রান্ত ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সরে এসে তার মননশীলতা, চিন্তাধারা এমনকি মন-মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ুগুলোকে উক্ত কাজে সম্পৃক্ত এবং মগ্ন রাখতে হয়। সমগ্র নভোমণ্ডল, সৌর মণ্ডলের মধ্যে পৃথিবীতে কোনস্থানে পড়ে থাকা একটা ছোট্ট নুড়ি-পাথরের যে অবস্থান, পৃথিবীর বাস্তব জীবনের মধ্যে একজন কাহিনীকারের মানসিক চিন্তাধারার সেই একই অবস্থান।

এরপরে আসে তার কথা যিনি উক্ত কাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন, তিনি পরিচালক। কাহিনীকারের মতই তিনি সমগ্র কাহিনীকে চিত্রনাট্যে সাজিয়ে হৃদয়ের পর্দায় প্রথমে দেখে থাকেন। কাহিনীকার কাহিনীর পটভূমি, কাঠামোগত দিক, চরিত্র বিন্যাস এবং পূর্বেউল্লিখিত উপাদান উপকরণ সজ্জিত করেন, কিন্তু পরিচালকের সৃষ্টি আরো ব্যাপক। কাহিনীর সবটুকুই আত্মস্থ করার পর পরিচালককে প্রতিটি সট্, শিল্পীদের মুখভঙ্গি, নড়াচড়া, তাদের আকর্ষণীয় দিকের সঠিক চিত্ররূপ দেয়া, নাচ-গান, ক্যামেরা ও অন্যান্য প্রযুক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবহার সম্বন্ধে ভাবতে হয় এবং কর্মে বাস্তব রূপ দিতে হয়। এইভাবে কাহিনী ও তার থেকে নির্মিত চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত প্রযোজক, শিল্পী ও কুশলীদেরকে একই বাহ্যিক ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হতে হয়, ভাবতে হয়, পছন্দ করতে হয় এবং অপরের পছন্দ ও চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করতে হয়। এসব চিন্তাধারার মধ্যে ন্যায় ও অন্যায়ের কোন স্থান নেই, অন্যের পছন্দই পছন্দ। এখানেই জননেতা ও অভিনেতার স্বরূপ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সবাই এমন শাসকের সৃষ্ট- যারা জনগণ ও দর্শকের পছন্দের কথা বা বস্তু সরবরাহ করে হাততালির আশায়। ন্যায়, অন্যায় আদর্শ, সত্য-এসবের কোন প্রশ্ন নেই। এক্ষেত্রে সিনেমা হলের পর্দা আর সমাজের পর্দা একই কথা বলে, একই রূপ তাদের কারণ তাদের রচয়িতা ও পরিচালক অভিন্ন সত্তার অধিকারী। তারা শুধু মন ভুলানো বড় বড় কথা বলে হাততালি চায়।

এখন সহজেই অনুমেয়, যারা সার্বক্ষণিকভাবে একটা বিশেষ দিকের প্রতি মনোনিবেশ করে, যে দিকটা অবৈধ প্রেম, অবৈধ যৌনাচার ও চিন্তাভাবনার অশ্লীলতার বাস্তব স্বাক্ষর। তাহলে তাদের মানসিক স্তর, স্বরূপ। তাদের আদর্শিক রূপ, রঙ, আকৃতি এবং সমাজ, মানুষ, দেশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ কেমন এবং কি হতে পারে। উক্ত মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীদের সৃষ্ট 'আনন্দ' উপভোগ করে চৌদ্দ থেকে ত্রিশ বছরের দর্শকবৃন্দ। উক্ত 'আনন্দে' মানসিকতা সতেজ হয়, মন তরতাজা হয়, ক্লান্তি ধুয়ে মুছে যায়, এ মন্তব্যগুলো তো সেই মাধ্যমগুলোই বলে, যাদের মাধ্যমে শাসকচক্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

www.bjilibrary.com

প্রতিফলিত হয়। মাধ্যমগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো কলেজ ও ভার্সিটির কিছু জড়বাদী, ভোগবাদী, নাস্তিক এবং বিকৃত মস্তিষ্কের শিক্ষক। এদের কল্যাণে চলচ্চিত্র এবং সঙ্গীত যা গত পঁচাত্তর বছর ধরে অবৈধ প্রেম, অবৈধ যৌনাচার, অশ্লীলতা এবং তদসংক্রান্ত আকর্ষণ, লোভ-লালসা এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করে আসছে, তার প্রচার ও প্রসার ব্যাপক হয়েছে। উক্ত শিক্ষক শ্রেণীকে শাসকচক্র বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করে, জনগণের কাছে তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে রাখে।

চৌদ্দ থেকে ত্রিশ বছরের চলচ্চিত্রের মূল দর্শক, যারা চলচ্চিত্র ও সঙ্গীতের উৎকট সমর্থক এবং চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত জগতটার শাসকশ্রেণী আর এইসব শাসক শ্রেণীর শাসক অর্থাৎ দেশের শাসক শ্রেণী- এদের সমষ্টিগত মানসিক পছন্দ-অপছন্দ, ভাবনা-চিন্তা, আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্যতায় সৃষ্ট, লালিত-পালিত চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত গত পঁচাত্তর বছর ধরে একই রূপ, রঙ, রস নিয়ে সিনেমা হলের পর্দায় হাজির হচ্ছে। অন্যান্য মাধ্যমগুলির সঙ্গে রেডিও এবং টিভিও মুখর তার প্রচারে। ঠিক যেমন যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন শাসক শ্রেণী ক্ষমতাসীন হচ্ছে দেশের সিংহাসনে- সবারই রঙ, রস ও রূপ ঐ চলচ্চিত্র ও সঙ্গীতের মত একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে। আদর্শিক কোন পরিবর্তন নেই, নীতির পরিবর্তন নেই, দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতা নেই, চিন্তাধারা প্রসারতা নেই। কিন্তু তাদের মাধ্যমগুলো বলে শুধু তাদেরই দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা আছে, তারাই শুধু ব্যাপক চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা রাখে, মুক্ত চিন্তার উদ্ভাবনকারীরা তাদের কাছে তাদের দেবতা। সমতুল্য। যে গাছে ফল হচ্ছে না- তার গোড়ায় সার, মাটি, পানি দিয়েও কোন লাভ নেই। নতুন বীজ বপন করাই যুক্তিযুক্ত। তেমনি যে আদর্শে দেশ ও জাতির উন্নতি হয় না- সে আদর্শহীন আদর্শ আর কত যুগ ধরে পরীক্ষামূলকভাবে চলবে? নতুন আদর্শের বীজ বুনতে হবে, সেখানে নতুন মাটি, নতুন সার, নতুন পানি সিঞ্চনে গড়ে উঠবে উন্নত সুশিক্ষিত, সভ্য এক উন্নত জনগোষ্ঠী।

চলচ্চিত্রের কাহিনীতে আদর্শকে সব সময় হত্যা করা হয়। এটা আশ্চর্যজনক কোন ব্যাপার নয়। কারণ শাসকগোষ্ঠীর নীতিই আদর্শকে হত্যা করা। চলচ্চিত্রের কাহিনীতে প্রথমেই একটা আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করা হয়। যিনি মানবতার কথা বলেন, কল্যাণের কথা বলেন, আদর্শের পক্ষে যিনি লড়াই করেন এবং তাকে হত্যা করা হয় কাহিনীর প্রথম পর্বেই। সমাজের লোকজন প্রায়শঃ বলে থাকেন, "আজকাল ভালো থেকে কিছু করা যায় না"-। চলচ্চিত্রের কাহিনীর ঐ বিশেষ আদর্শ যেন তারই উৎকৃষ্ট সমর্থক। এইভাবে চলচ্চিত্রের কাহিনীতে আদর্শকে কখনো প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ব্যক্তি আক্রোশ, প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধপরায়ণতা। যা শাসক চক্রের আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

www.bjilibrary.com

আমাদের দেশে একটা চলচ্চিত্রের কাহিনী নির্মাণ থেকে শুরু করে পর্দায় হাজির হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ কাহিনীকার থেকে ভোক্তা পর্যন্ত একটা বিশেষ মানসিক বলয়ে বন্দি। এ বন্দিত্ব আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট নয়। এর নির্মাণ কাজের সঙ্গে যারা জড়িত তারা যেমন সার্বক্ষণিকভাবে এর চিন্তায় মশগুল তেমনি ভোক্তা তথা দর্শকরাও তা দেখার পর ইন্দ্রিয় উসকে দেবার উপকরণের খোঁচায় সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে। চৌদ্দ থেকে ত্রিশ বছরের দর্শক শ্রেণী যখন তাদের শিক্ষাদীক্ষা, পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং মননশীলতা গঠনে তৎপর এবং সেই ভাবনায় ব্যাকুল থাকার কথা তখনই চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্র সৃষ্ট সঙ্গীত তাদের মন-মানসিকতাকে ও চিন্তাধারাকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করছে তা সহজে অনুমেয়। অল্প একটু পিছন দিকে তাকালেই একজন বোদ্ধা ব্যক্তি স্বীকার করবেন যে, তিনি যখন তার যুবক বয়সে চলচ্চিত্র দেখতেন তখন মানসিকতা ও চিন্তাধারা কিভাবে আচ্ছন্ন থাকতো। যার কারণে তিনি যখন সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করেন, তার সন্তান যখন যুবক হয় তখন সেই যুবক সন্তানকে তিনি চলচ্চিত্র দেখতে নিষেধ করেন। তার কারণ শিক্ষাজীবন এবং বাস্তবমুখী মানসিকতা গঠনে চলচ্চিত্র এবং সঙ্গীত তাদের একাগ্রতা, মনোনিবেশের ধৈর্য, কোন বিষয়বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করার মানসিক শক্তি এবং কল্যাণমুখী মানবিক শক্তিকে পঙ্গু করে দেয়। কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। অলসতায়, ভোগে, কর্মস্পৃহা কমে যায়, ভোগবিলাসে লিপ্ত হয় এবং অল্পশ্রমে বেশি অর্থ আয় করার প্রবণতায় পেয়ে বসে, তখন তারা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা দায়িত্বে ফাঁকি দেয়, কর্তব্যবোধ ও মানবিকতা-মোট কথা মানবীয় গুণের বেশির ভাগই তাদের দুর্বল হয়ে যায়।

দীর্ঘ বছর ধরে দিনের পর দিন চলচ্চিত্রের কাহিনী ও সঙ্গীত দর্শক-শ্রোতাকে যা দিয়ে আসছে, তা চোখ ও কানের মাধ্যমে অন্তরের ওপর এক ধরনের আবেশ ছড়িয়ে দেয়, যা একটা যাদুক্রিয়ার মত। দীর্ঘক্ষণ ধরে তার তরঙ্গায়িত ঝংকার অন্তরের মধ্যে এক ধরনের 'ভাব' বিস্তার করে রাখে এবং তা কাটতে কাটতেই নতুন কাহিনী, নতুন সঙ্গীত স্থান দখল করে নেয়। যেহেতু কাহিনী ও সঙ্গীতের মধ্যে শুধুমাত্র নারী-পুরুষের অর্ধেক প্রেম ও প্রেম সংক্রান্ত আনন্দানুভূতি, দুঃখ-বেদনা থাকে আর কিছুই থাকে না এবং তার আরো শক্তি হলো সে প্রেমিক-প্রেমিকাকে প্রেমের কথা বলার ভঙ্গি শেখায়, সংলাপ ক্ষেপণ ও তার মাধুর্য শেখায়, একে অপরকে স্পর্শ করার স্টাইল শেখায়, দৃষ্টিপাতের ভঙ্গি ও ভ্রূ অভিব্যক্তি শেখায়, শেখায় পোশাক ও চুলের ফ্যাশন। যারা এ ভাবের-রাজ্যে বিচরণ করে তারা তাদের কর্মজগতের চিন্তাভাবনার চেয়ে উক্ত শিক্ষাগুলিকে মানসিকভাবেও বাস্তব ক্ষেত্রে অনুশীলনে তৎপর থাকে বেশির ভাগ সময়। তারা উক্ত কাজগুলিতে ভীষণ ধৈর্যশীল হয় কিন্তু অন্যসব কাজে অধৈর্য হয়ে ওঠে।

www.bjilibrary.com

তারা মানসিক সুস্থতা ও স্থিরতার পরিবর্তে ভীষণভাবে মানসিক অস্থিরতায় ভোগে, অনেকে অস্থিরতার কারণেই নেশাগ্রস্ত হয়। তারা সহসাই কোন ব্যাপারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যদিও পর মুহূর্তে শান্ত হয়ে যায়। অবৈধ প্রেম ও যৌনাচারই শুধু নয়, সমস্ত অবৈধ কর্মের দিকে তাদের ঝোঁক প্রবণতা বাড়ে। এর মধ্যে যারা লেখাপড়া জানে তারা তাদের অবৈধ কর্মের চৌর্যবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তিক চাতুর্যে গোপন রাখতে সক্ষম হয়। তারা ন্যায় কাজের সমর্থন করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। কারণ তারা নিজেরাই অপরাধী। অন্যদিকে অন্যায় কাজে প্রতিরোধ তো দূরের কথা, অন্যায় কাজে তারা মানুষকে উৎসাহিত করে যাতে নিজের দলের লোকসংখ্যা বেড়ে যেতে পারে। অন্যায়কে ন্যায় হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য তারা বহুতর যুক্তির আশ্রয় নেয়।

চলচ্চিত্রের কাহিনী ও তদসংক্রান্ত সঙ্গীতকে দোষারোপ করতে হলে উপরোক্ত বিষয়েই দোষারোপ করা উচিত। যারা মানুষের কল্যাণ কামনা করেন তারা একটু চিন্তাভাবনা করলেই বুঝতে পারবেন আমাদের চলচ্চিত্রের কাহিনী এবং সঙ্গীত (টিভি নাটক, টেলিভিশন ও সঙ্গীত একই গোত্রীয়) একটা বিশেষ বয়সের প্রজন্মকে, তাদের মন-মানসিকতা গঠন, চিন্তাধারার গঠনমূলক দিক, সৃজনশীলতা নতুন নতুন কল্যাণমুখী চিন্তা-চেতনা, উদ্যম উৎসাহকে বন্ধ করে দিচ্ছে। এরাই সাধারণত পরিণত বয়সে পেশাগত ক্ষেত্র হিসেবে তথাকথিত অসৃজনশীল নাট্যকার অভিনেতা, পরিচালক, সঙ্গীত শিল্পী অথবা তোষামোদী সাংবাদিক-সম্পাদক সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজক, বিরক্তিকর বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাতা অথবা অশ্লীলযুক্ত চিন্তার শিক্ষক হিসেবে কলেজ-ভার্সিটিতে যোগ দেয় এবং নিজদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, প্রেমময় কথা (যা তারা চলচ্চিত্রের কাহিনীর সংলাপ থেকে শিখেছে) দিয়ে শাসক চক্রের বিভিন্ন অফিস আদালতে দুর্নীতির প্রসার ঘটায়। আর নিজেদের ভোগবাদকে এবং অবৈধ যৌনাচারকে অন্যের মাঝে সংক্রমিত করে। এরাই তাদের ভারসাম্যহীন চিন্তাধারা দিয়ে জাতিকে প্রতিমুহূর্তে বিভক্ত করার চেষ্টা করে।

একশ্রেণী, মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ বলেন, 'বিনোদন মানুষের মানসিকতাকে সতেজ করে, উদ্যমী করে এবং চিন্তাধারার বিকাশ ঘটায়।' সংজ্ঞাটি সর্বাঙ্গীন সত্য নয়। যেমন-

(ক) একজন স্যুটেড-বুটেড লোক কর্দমাক্ত রাস্তায় আছাড় খেলে, একশ্রেণীর লোক হেসে উঠবে, (শ্রেণীটি সবার পরিচিত) এবং আনন্দ পাবে, কিন্তু দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি আনন্দিত তো হবেই না বরং সহ-মর্মিতা প্রদর্শন করবে।

(খ) কোন কাহিনীর কোন চরিত্রের কমেডি দেখে একশ্রেণীর দর্শক হয়তো আনন্দ পেলো, কিন্তু উক্ত কমেডি দর্শক নিজে কখনো করবে না।

www.bjilibrary.com

গ) মেয়েদের না ও সৌন্দর্য প্রদর্শনীতে একশ্রেণীর দর্শক আনন্দ পায়।

ওপরে বর্ণিত কর্মকাণ্ড দেখে যারা আনন্দ পায়, এই শ্রেণীর মানুষ ভোগবাদ, প্রভুত্ব প্রিয়তা, ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ ইত্যাদিতে লিপ্ত হতে পারে, কিন্তু তারা আদর্শবাদী নয়, সার্বজনীন চিন্তাধারার অধিকারী নয় এবং সৃজনশীলও নয়। তারা যা কিছুই চায় হতে পারে, কিন্তু তা তাদের কূটচক্রের ফসল এবং মিষ্টি ছন্দায়িত কথা, বড় বড় প্রেমময় কথার জাল পেতে দুষ্ট এবং অবৈধ পথে প্রাপ্তি ঘটায়। সঠিক যোগ্যতা, মেধা, সত্যপ্রিয়তা, বৈধকর্মকাণ্ড কখনো তাদেরকে উচ্চাসনে বসায় না। কেননা তাদের আনন্দ লাভের উপাদান ও উপকরণগুলিই হচ্ছে অমানবিক এবং সুষ্ঠু, সত্য ও সৃজনশীল চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। তারা কখনো মানবিক ও বৈধ পন্থায় সফল হওয়া যায় এ ধারণায় বিশ্বাসী নয়। কারণ তাদের আনন্দ তাদেরকে তরতাজা সতেজ করেনি। বরং মানসিকতা ও চিন্তাধারাকে অসুস্থ করেছে, বিকৃত করেছে, তাদের সত্য অনুধাবন ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।

আমাদের দেশে আনন্দ লাভের যেসব পন্থা বিরাজমান তা জড়বাদী, ভোগবাদী, অমানবিক, ক্ষমতা লোভী বিকৃত চিন্তার ব্যক্তি তৈরিতে সাহায্য করে। আর যারা ঐসব পন্থা উদ্ভাবন, আমদানি, লালন ও প্রদর্শন করে তারা উক্ত মানসিকতাসম্পন্ন। আনন্দ লাভের মাধ্যম যা সত্যিকার অর্থে মন্দ, ক্ষতিকারক যা মানসিকতাকে সতেজ তো করেই না, উদ্যমীও করে না বরং অস্থির করে, ধৈর্যহীন করে, অবসাদগ্রস্ত করে, ভিন্ন পাপগ্রস্ত পথে ধাবিত করে তা অবশ্যই বর্জন করার মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে।

যেকোন নেশার বস্তু প্রথমেই একটু সতেজ করে, তারপর নেশাগ্রস্ত মানুষটি শারীরিক ও মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সুস্থ চিন্তাধারা হারিয়ে ফেলে। একসময় সে আবার নেশা করে এবং প্রথম প্রথম আবার একটু সতেজ হয়। তাই সে মনে করে নেশার বস্তুটি তাকে সতেজ করে, তরতাজা করে এবং সেই চিন্তাধারায় সে ধীরে ধীরে নেশার রাজ্যে হারিয়ে যায়। ঠিক তেমনি আলোচ্য মানুষগুলি অশ্লীলতা ও অমানবিক আনন্দের নেশায় উত্তেজিত হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের মনের চিন্তারাজ্যের সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলো অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তারা অস্থিরতায় ভোগে এবং মনে করে অবসাদ ও অস্থিরতার কারণ ভিন্ন কোন ব্যাপার। তারা আবার অশ্লীল আনন্দ ভোগ করে এবং সতেজ, তরতাজা হয় বরং বলা যায় অবসাদগ্রস্ত শরীর উত্তেজিত হয়; বৃদ্ধশরীর যৌবনপ্রাপ্ত হয়, ঠিক তখন তারা বাণী ঝাড়ে যে, এই সব আনন্দ মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ায়, কর্মস্পৃহা বাড়ায়, মানুষকে সতেজ করে। এই বাণীর আলোকেই চৌদ্দ থেকে ত্রিশ বছর বয়সীরা পথ চলতে চেষ্টা করে।

www.bjilibrary.com

আনন্দ লাভের যেসব পন্থা আছে, মানসিক ভিত্তির আনন্দ লাভের যেসব পন্থা আছে, শ্রেণীভাগ হিসেবে ব্যক্তির মন সেসব পন্থার যেকোন পন্থাকে পছন্দ করে। তাই দেখা যায়, 'মুষ্ঠিযুদ্ধ' খেলাটি কারো কাছে হিংস্র ও অমানবিক। আবার অহেতুক সময় নষ্ট বলে অনেকে ক্রিকেট খেলা দেখে না। অনেকে ব্যান্ড সঙ্গীত পছন্দ করে, অনেকের মাথা ধরে।

অনেক বিশেষজ্ঞ অনেক কিছুই নির্দোষ আনন্দ লাভের মাধ্যম হিসেবে রায় প্রদান করেন। আবার অনেক কিছুকেই আনন্দ লাভের বিকৃত পন্থা মনে করেন। এক বিশেষজ্ঞের রায় আবার অন্য বিশেষজ্ঞ বাতিল করে দেন। তবে সত্য কথা এটাই যে, যে কোন মানুষ, তিনি পৃথিবীর যতবড় জ্ঞানী দার্শনিক হিসেবেই পরিচিতি পান না কেন, নিজস্ব আবেগ অনুভূতিকে অবজ্ঞা করে কোন কিছুর নিরপেক্ষ বিচারে বা মতামত ব্যক্ত করায় কেউ-ই সফল ও সার্বজনীন নন। কেউ তা দাবিও করেন না।

তাই মানুষকে এমন কিছুর মধ্যে সার্বজনীনতা খুঁজতে হবে, মানুষের সুস্থ বিবেক, বুদ্ধি, যুক্তি সততই দাবি করে যে এটাই সার্বজনীন মতামত বা আদর্শ বা মূলসূত্র বা মতবাদ। আর সঙ্গত কারণেই তা কোন মানুষের জ্ঞান সাধনার রায় নয় বা চিন্তা-গবেষণার ফল নয়। তা এমনই এক সত্তা হওয়া উচিত, যে সত্তা সবকিছু উর্ধ্বে, যে সত্তা মানুষ, মানুষের আবেগ, অনুভূতি, আনন্দ, শোক, দুঃখ, যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি মানুষকে তিনি ভালোবাসেন, সেই মানুষের জন্য তিনি তার প্রদত্ত জীবন-প্রণালীর যাবতীয় বিধান এবং চিন্তা করার অজস্র ফর্মুলা তাঁর পবিত্র 'কুরআন' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তার প্রতি ছত্রে ছত্রে মানুষের প্রতি তাঁর কি গভীর মমতা, কি সুগভীর পবিত্র ভালোবাসায় তিনি তা ব্যক্ত করেছেন। আরো রয়েছে পবিত্র কুরআনকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে পাঠানোর মাধ্যম রাসূল (সা.) এবং তাঁর নিজস্ব জীবন-যাত্রা, চিন্তাভাবনা, পছন্দ-অপছন্দ, জীবনের সকল দিকেরই বাস্তব পথনির্দেশ। মানুষ যে মাধ্যম ছাড়া কোন কর্মই সাধন করতে পারে না, যুগে যুগে নবী ও রাসূল (সা.) কে মাধ্যম করে আল্লাহপাক সেরকম একটা শিক্ষাই দিয়েছেন। মাধ্যমের সহযোগিতা মানুষকে নিতেই হয়। খাওয়ার জন্য হাতকে মাধ্যম করতে হয়। তেমনি দেখার জন্য চোখকে মাধ্যম করতে হয়। আর সব মাধ্যমকেই প্রতিটি মানুষ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও পবিত্র হিসেবেই ব্যবহার করতে পছন্দ করে। যেমন হাতকে পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত না করে মানুষ খেতে পারে না। পোশাককে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত না করে মানুষ শরীর ঢাকে না। অতএব মাধ্যম হবে সবচেয়ে স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য এবং পঙ্কিলতামুক্ত, উন্নত ও পরিচ্ছন্ন। মানুষের মননশীলতা, নৈতিকতা ও চিন্তার বিকাশ লাভের যত প্রকার আনন্দ ও শিক্ষালাভের মাধ্যম আছে, চলচ্চিত্র,

www.bjilibrary.com

রেডিও এবং টিভি থেকে শুরু করে কলেজ-ভার্সিটির শিক্ষক পর্যন্ত সবাই এর আওতায় আসা উচিত।

আল্লাহপাক তাঁর বিধান ও জীবনব্যবস্থার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন-কানুন যে মাধ্যমে পাঠিয়েছেন, সেই মাধ্যম সেই সাক্ষ্যই বহন করে। সঙ্গত কারণেই সে মাধ্যমগুলি মনুষ্য জাতির মধ্যে সবচেয়ে উন্নত, বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল ও পবিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত নবী রসূল নামক মানুষই হবেন। তেমনি, জ্ঞানার্জনের লিখিত মাধ্যম পবিত্র কুরআন। পৃথিবীর সমস্ত লিখিত বস্তুর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও স্বতন্ত্রভাবে স্বচ্ছ মাধ্যম। আর তাই উক্ত মাধ্যম দু'টি অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস তথা রাসূল (সা.)-এর জীবন পদ্ধতিকে অনুসরণ করাটাই প্রকৃত বুদ্ধিমান মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কর্ম হওয়া উচিত।

মানুষ তো আনন্দিত থাকতে চায়, আনন্দ পেতে চায়। আর যেহেতু 'আনন্দ' সরাসরি মন ও চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে বলে মানসিক সুস্থতার জন্য এমন ধরনের আনন্দের সৃষ্টি করা উচিত যা সুস্থ, কর্মঠ, সৃজনশীল, উদ্যমী ও আদর্শ মানুষ গঠনে সাহায্য করে। আল্লাহপাকের কিতাব, রাসূল (সা.)-এর সমাজ, রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবন এবং সাহাবা (রা.) দের জীবনধারা, তাঁদের রাজনৈতিক জীবন, আজ আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে উপস্থিত। তাঁদের জীবন প্রবাহে আধুনিক কম্পিউটার ও প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল না কিন্তু তার ব্যবহারিক কার্যবিধির মৌলনীতির উপাদান উক্ত মাধ্যমেই উপস্থিত। যেমন পারমাণবিক বোমা আমাদের দেশে তৈরি হয় না, ব্যবহারও হয়নি কিন্তু তার ব্যবহারিক মৌল বিধি রয়েছে।

কুরআন ও হাদীসে যা স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে তাকে ইসলামসম্মত করার নানা যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় বরং ফিতনার জন্ম দেয়া। এটাও খাবো ওটাও খাবো- এই নীতিটা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে তাই কোন সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই নীতিকে সমর্থন করে না। ইহকাল ও পরকাল এ দু'টোকেই সামনে রাখতে হবে এবং সেই আলোকেই একজন কাহিনীকারকে তার কাহিনী নির্মাণ করতে হবে। কাহিনীর মধ্যে জড়বাদী আনন্দের উৎস সৃষ্টি করে পরকাল প্রাপ্তির আশা করা বোকামি ছাড়া কিছু নয়।

'ইসলাম মানুষের চিন্তাধারাকে সংকীর্ণ করে দেয়', 'মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে'-ইত্যাদি ধরনের অপবাদ সৃষ্টির প্রথম থেকেই অপবাদ রটনাকারীরা আরোপ করে আসছে। ইসলাম সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। বরং চলচ্চিত্রের কাহিনী ও সঙ্গীত আলোচনায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা সংকীর্ণতার অপবাদ দেয় তারা গত পঁচাত্তর বছর ধরে কত নোংরা ও সংকীর্ণতায় বন্দী হয়ে আছে। হাজার হাজার চলচ্চিত্র, লক্ষ লক্ষ সঙ্গীত তার প্রমাণ। শুধুমাত্র অবৈধ প্রেম ও যৌনাচার ছাড়া

www.bjilibrary.com

তাঁর মধ্যে কিছুই নেই। অথচ ইসলাম মানুষের জন্য বিশাল চিন্তার জগত তৈরি করে রেখেছে, আল্লাহপাক সেসব নিয়ে মানুষকে চিন্তা করতে বলেছেন। আর সত্যিই তা মানুষের চিন্তার বিকাশ ঘটায়। শুধু জাহেলিয়াতের চিন্তাভাবনা ও রুচিকে ধ্বংস করে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবতে হবে। এই সত্যকে সামনে রেখেই চলচ্চিত্রের কাহিনী ও সংগীতের অবয়ব তৈরি করা উচিত। তাহলে পৃথিবীবাসী পাবে চিন্তাজগতের বিশাল ও ব্যাপক খোরাক।

অত্যন্ত নিরস হিসেবে পরিচিত 'অংক' এবং অংক সংক্রান্ত কার্যাবলীতে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে সেই নিরসকেই মানুষ সরস করে তোলে এবং অনেক 'ভালো' ছাত্রকে চৌকস অংকবিদ করে তোলে। সেই উৎসাহ উদ্দীপনার উপাদান কি? উপাদান হচ্ছে, যে দূষিত পদার্থ বা চিন্তা, ভয় শিক্ষার্থীর কাছে অংককে নিরস হিসেবে পরিচয় করিয়েছে সেই দূষিত পদার্থকে জড়বিদদের মত প্রভুত্ব, অভিভাবকত্ব দিয়ে দূর করার মিথ্যা চেষ্টা না চালিয়ে ইসলামসম্মত বন্ধুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করা এবং মন্দকে মন্দ হিসেবে প্রমাণিত করে মানসিক স্বাধীনতা প্রদান করে, উৎসাহ যুগিয়ে অংককে তার কাছে রসময় করে তোলা। যার কাছে ধৈর্য ও সহ্যগুণ শিখতে হবে, তিনি রাসূল (সা.)। একজন অভিভাবক বা শিক্ষককে উক্ত ধৈর্য ও সহ্যগুণ অবলম্বন না করলে শিক্ষার্থী কখনো 'অংকে' জয়লাভ করতে পারবে না। সে সহজ আনন্দের পথ বেছে নেবে এবং তার চিন্তার বিকাশ আর সাধিত হবে না। চলচ্চিত্র, সঙ্গীত তথা বাদ্যযন্ত্রের মত অসৃজনশীলতা থেকে যে ক্রোধ জন্ম নেয়, ধৈর্যহীনতা জন্ম নেয় তা সাধারণ শিরকবাদী মানসিকতা তৈরি করে এবং মুশরিকদের সংস্কৃতিই মুসলিমদের মধ্যে উক্ত দোষগুলির জন্ম নিয়েছে বিধায় কিশোর শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের সময় তারা ধৈর্যহারা হয়ে মারধর শুরু করে। অথচ রাসূল (সা.) শুধু নামাজ না পড়লে মারতে বলেছেন, অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়। রাসূল (সা.) তাঁর কর্ম দিয়ে তা বাস্তবে প্রমাণও করে গেছেন। যেমন- যুদ্ধের মত ভয়ঙ্কর টেনশন আর কিছুতেই নেই, তার ওপর শত্রুপক্ষের অস্ত্রসজ্জা, সৈন্য সংখ্যা প্রচুর, প্রবল শক্তিধর তারা। ঐদিকে রাসূল (সা.)-এর সৈন্য সংখ্যা কম। অস্ত্রভাণ্ডার প্রায় শূন্য, ঘরে বাইরে শত্রু, অন্যদিকে যুদ্ধটা শুধু জীবন-মরণের প্রশ্ন নয় বরং পরাজিত হলে- ইসলামের অস্তিত্বই মুছে যাবে, তার ওপর তিনশত সৈন্য চলে গেছে। তারা আবার রাসূল (সা.)-এর অনুপস্থিতেতে মদিনায় কি ঘটিয়ে বসে কে জানে, এই প্রবল টেনশনের মধ্যে দু'টো কিশোর জ্বালাতন শুরু করে দিলো। আইনগত দিক দিয়ে একজন বয়সে কম হওয়ায় যুদ্ধের অনুমতি পেল না। একজন উঁচু বা লম্বা দেখানোর জন্য পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে বলে আমি বড় হয়েছি আমি যুদ্ধে যেতে পারবো, অন্যজন বলে ওকে আমি কুস্তিতে হারিয়েছি আমিই বা কম কিসে! প্রবল টেনশনের মধ্যে অন্য কোন নেতা হলে দুটিকে কান ধরে বের করে দিতেন অথবা ভীষণভাবে ধমক

www.bjilibrary.com

দিতেন, কিন্তু রাসূল (সা.) মানবজাতির পথ কিভাবে প্রদর্শন করে গেছেন সেটা অবশ্যই লক্ষণীয় অনুসরণীয়। তিনি রাগলেন না, বকলেন না, নিরুৎসাহিত করলেন না, তিনি কুস্তির ব্যবস্থা করলেন। বালক এবং দু'টি কুস্তি লড়লো এবং 'সামারাহ'- যে বলেছিল কুস্তিতে ওকে হারিয়েছি সে জিতে গেল। অপর বালকটি রাফে' তার সঙ্গে সেও যুদ্ধে যাবার অনুমতি পেল। সমাজের অভিভাবক ও শিক্ষক শ্রেণী রাসূল (সা.)-এর ধৈর্যশীলতাকে আয়ত্ত করতে পারলে চৌদ্দ বছরের বালক অবশ্যই তার নিজস্ব কাজের মধ্যে আনন্দ পাবে, সে সিনেমা হলে গিয়ে অবৈধ প্রেম, যৌনাচার এবং নাচ ও সঙ্গীতের মধ্যে আনন্দ খুঁজবে না।

ইউরোপ আমেরিকায় আইন পাস করে অভিভাবক ও শিক্ষক শ্রেণীকে ধৈর্যশীল হতে বাধ্য করেছে। অধৈর্য হয়ে মারধর করলে বা কিশোরকে বাধ্য বা প্রত্যাখ্যান করলে আইনত দণ্ড অবধারিত। কর্মমাধ্যমে মানুষ আনন্দিত হতে পারে, সে আনন্দ মানুষকে সত্যিকারভাবে সতেজ করে। সৃজনশীল করে। আহত রক্তাক্ত পঙ্গু রোগীদের আহাজারীর মধ্যেও সেরকম রোগী সেবা করে আনন্দ লাভ করে। চামড়ার কারখানায় দুর্গন্ধের মধ্যেও একজন কারিগর আনন্দ পায়। সে আনন্দ পায় সৃজনশীলতার আনন্দ। এসবই কর্মমাধ্যমের আনন্দ। জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদ সংকীর্ণতার দোষে দুষ্ট বলে সব সময় নেতিবাচক দিককেই তারা প্রাধান্য দেয়। আর তাই কর্মমাধ্যমগুলোকে তারা সব সময় দোষারোপ করে তাদের কাহিনীর মধ্যে। 'কাজ করতে করতে যক্ষ্মা হয়ে গেল', একদিকে একজন কাজ করছে অন্য দিকে তার সন্তান না খেয়ে মারা যাচ্ছে', বা 'ক্যান্সার হয়েছে, অর্থ নেই- তখন লোকটি হয়ত চুরি করলো'। এইভাবে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা তাদের রচনায় পাই। কিন্তু ইসলামী কাহিনী এবং তার চরিত্রগুলি ও তাদের কর্মজগৎ সব সময় হবে ইতিবাচক, গঠনমূলক আর তখনই জড়বাদী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় স্পষ্ট হবে। ইসলাম যে ব্যাপক, বিশাল তা প্রমাণিত হবে, কাহিনীর মধ্যে সেই ইতিবাচক উপাদান গ্রোথিত করতে হবে। কর্ম ব্যতীত মানুষ যেসব ক্রিয়াকলাপ অলস বলে উপভোগ করে সেইসব ক্রিয়াকলাপ প্রদত্ত আনন্দের স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত, তাতে কি সত্যিকার আনন্দের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ হবে? অনেকে মনে করেন ইসলামসম্মত কাহিনীতে সে ধরনের আনন্দ প্রদান করা ই সম্ভব। তার পরীক্ষামূলক প্রচারণা ইতিমধ্যে টি.ভি চ্যানেলে নাটকের মাধ্যমে প্রদর্শীতে হয়েছে। যদিও সেসব কাহিনী রচনা ও পরিচালনায় প্রকট সমস্যা মনে হয়েছে যেমন, একটা কাহিনীতে দেখা গেল, পর্দানশীন স্ত্রী-স্বামীকে সুপথে আনার অভিপ্রায়ে স্বামীর সব অন্যায় আবদারকে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। পর্দা খুলে ফেলে, মদের টেবিলে বসের' সাথে বসে ব্যবসায়িক আলাপ করে এবং পরবর্তীতে স্বামীকে মিথ্যা বলে ভাইয়ের বাসায় যায়, স্বামী তো জানেই স্ত্রী ব্যবসায়ীর সঙ্গেই আছে। সে আল্লাহর কাছে দোয়া করে "আল্লাহ আমার স্ত্রী

www.bjilibrary.com

যেন ভালো থাকে"। স্ত্রী মিথ্যা বলার মত পাপ কাজ করে চেষ্টা করছে স্বামীকে সুপথে আনার, অথবা যার সঙ্গে মদের টেবিলে বসছে, সে লোক অন্যকে বলছে 'মহিলাটি ভালো'- এর অর্থ কি এই নয় যে মহিলা তার দাবি পূরণ করেছে! অথবা হাস্য কৌতুকের দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, ভাত প্লেটে নিতে লোকটি বিসমিল্লাহ, তরকারি নিতে গিয়ে বিসমিল্লাহ, মুখে তুলতে গিয়ে বিসমিল্লাহ বলছে, এবং উপস্থাপক বলছেন আসুন আমরা সবক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ বলা অভ্যাস করি। কিন্তু আসলে কি খাওয়ার সময়ে 'বিসমিল্লাহ' শব্দের মুসলমানরা এমনভাবে শ্রুতিকটু করে অপব্যবহার করে?

এই যে ব্যাপারগুলো এছাড়াও রয়েছে ক্যামেরা ব্যবহারে ত্রুটি, ক্যামেরাকে মনে করা হয় মানুষের চোখ। ইসলামী চলচ্চিত্র বা নাটকে ক্যামেরা শুধু মানুষের চোখ নয়, একজন সত্যিকার মুসলমানের চোখ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইসলামসম্মত চলচ্চিত্র বা নাটকে ক্লোজ সট, মিড সট, টিল্ট আপ, টিল্ট ডাউন, প্যানিং, চার্জ, এসবের ব্যবহার এবং প্রয়োগ অবশ্যই ভিন্ন। একটা সটের পর দ্বিতীয় সটের আঙ্গিক, অথবা একটা সিন থেকে পরবর্তী সিনে 'কার্ট' করে বা 'মিক্স' করে যাবার পদ্ধতিগুলো অবশ্যই পরিচালককে বুঝতে হবে, জানতে হবে। চলচ্চিত্রটি বা নাটকটি দেখলে যেন মনে হয় এটা ভিন্ন, এটা অন্য।

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ, সঙ্গীত- মোটকথা ক্যামেরা দিয়ে কেউ যদি সাহিত্য রচনা করতে চায় এবং তাকে চলচ্চিত্র বা নাটক আখ্যা দিয়ে 'ইসলামী' বলে দাবি করে তবে অবশ্যই তাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তার প্রতিটি সুতো গাঁথতে হবে, নতুবা তার দাবি শুধু ভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত হবে তা নয়, উপরন্তু এটাই প্রমাণিত হবে যে সে ব্যক্তি নিজেকে পরিচিত করিয়েছে মুসলিম হিসেবে এবং প্রমাণিত হবার পর সে ইহুদিদের চরিত্র ধারণ করে ইসলামের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হয়েছে।

যদি কেউ মনে করে পূর্ণ ইসলামী চিন্তাধারায় চলচ্চিত্রের কাহিনী ও চলচ্চিত্র নির্মাণ করে সিনেমা হলে মুক্তি দিলেই দর্শক হুড়মুড় করে পাগলের মত টিকিট কিনে দেখতে আসবে সেটা ভুল হবে। একজন জাহেলিয়াত সমাজের লোক, যে জাহেলিয়াত সামজের হাসি গানে অভ্যস্ত, সেখানকার যত অমানবিক, অশ্লীলতা এবং কোন শিক্ষাহীন আনন্দ ধারায় তার মন-মানসিকতাকে লালন করে পরিতৃপ্ত থেকেছে, মনকে ও চিন্তাধারাকে পুষ্ট করেছে এবং ঐ সময় অমানবিক ও অশ্লীলতাকে ন্যায় হিসেবে গণ্য করতে শিখেছে, লজ্জাবোধের অনুভূতি যার নষ্ট হয়ে গেছে, সঠিক ন্যায় অন্যায়কে যে নিজের স্বার্থ চিন্তায় সঠিক বলে মানতে নারাজ, যার কাছে ব্যভিচার সিদ্ধ, যিনি অবিবাহিত ছেলেমেয়েকে একত্রে স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাসকে আধুনিক বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, এসমস্ত নামধারী

www.bjilibrary.com

মুসলিম ব্যক্তি হঠাৎ করেই ইসলামী চলচ্চিত্রের দর্শক হবে না। তারা যে মাধ্যম থেকে আনন্দ সংগ্রহ করেন, ইসলামে তা নেই ঠিক যেমন একজন প্রকৃত মুসলমান যেসব মাধ্যম থেকে আনন্দ আহরণ করেন জাহেলিয়াতের মধ্যে নেই।

যে ছেলেটা সারারাত জেগে অশ্লীল যাত্রানুষ্ঠান দেখে আনন্দ পেতো, সে একসময় সারারাত জেগে ওয়াজ মাহফিলে ওয়াজ শুনে আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে দেয়, যাত্রা দেখার আনন্দ তাকে আর ডাকে না। কারণ তার অন্তরাত্মা সত্যের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেয়েছে। অন্যদিকে চোরকে সুপথে আনার জন্য চোর হতে হবে এবং ভালো ভালো কথা বলে একসময় চোরকে সুপথে আনা যাবে এটা ভুল ধারণা তাহলে মুশরিকদের সরাসরি দাওয়াত না দিয়ে রাসূল (সা.) তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, পূজাঅর্চনা করতে করতে (নাউযুবিল্লা) ধীরে ধীরে তার ক্ষতিকারক দিকগুলি তাদেরকে বুঝিয়ে নিজেও ছেড়ে দিতেন, তাদেরকেও ছাড়াতেন। ইসলাম এমন ধরনের কোন জীবনব্যবস্থা নয়, যা কাপুরুষ, চরিত্রহীন ও সুযোগসন্ধানী লোক গ্রহণ করে। অতএব যারা কাহিনী রচনা করবেন, চলচ্চিত্র ও নাটক তৈরি করবেন তারা যদি ভেবে থাকেন জাহেলিয়াতের পন্থায় এসব করতে করতে একসময় পূর্ণ ইসলামী হয়ে যাবো তা প্রচণ্ড ভুল হবে। বরং তারা এক সময় জাহেলিয়াতের সঙ্গেই মিশে যাবে। তাদের প্রকৃতি তাই-ই দাবি করে।

ইসলামী চলচ্চিত্রের কাহিনী নির্মাণের উপাদান অবশ্যই একজন কাহিনীকারকে কুরআন হাদীস এবং সাহাবীদের কর্মধারা প্রসঙ্গে জানতে হবে। জানতে হবে তাদের কর্মধারার সঠিক ব্যাখ্যা। নতুবা আল্লাহ না করুন ইসলামী চলচ্চিত্র, ইসলামী নাটক এমন ইমেজ সৃষ্টি না করে যার পরিণতিতে 'ইসলামী মদের দোকান', 'ইসলামী সুদী 'ব্যাংক' এসব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভালো কাহিনী যেমন পরিচালনার ত্রুটির জন্য বাজে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি বাজে অভিনয়ও ভালো কিছু বক্তব্যকে নষ্ট করে দিতে পারে। অতএব পরিচালক, অভিনেতা এমনকি ইসলামী চলচ্চিত্রের একজন প্রোডাকশন বয়কেও ইসলাম বিষয়ে শিক্ষা এবং আমলী যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

যেহেতু ইসলামী চলচ্চিত্রের সবকিছুই ভিন্ন, সেহেতু হয়তো দেখা যাবে একটা সট নেবার সময় একজন প্রোডাকশন বয় তার জাহেলিয়াত দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন একটা মন্তব্য করে বসবে যে পুরো পরিবেশের 'মুড' টাই নষ্ট হয়ে যাবে।

যেসব মানুষ জাহেলিয়াতের রঙ, রূপ, রস তার আকার প্রকার এখনো বুঝে উঠেনি আবার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা থেকে জাহেলিয়াতের চিন্তা-ভাবনা, পছন্দ-অপছন্দ, বিচার-আচার ইত্যাদি দূরীভূত করতে পারেনি তারা কখনোই ইসলামী চলচ্চিত্র বা নাটকের ক্লাপটিক ধরারও যোগ্যতা রাখে না।

www.bjilibrary.com

মনে রাখতে হবে জাহেলিয়াত শাসকচক্র বা ক্ষমতাসীনদের কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ যদি জাহেলিয়াত চিন্তাধারার কোন ব্যক্তি করে তবে তার প্রতিবাদ যতই ন্যায় বা আদর্শিক হোক, সে জাহেলিয়াত পন্থাতেই তা করবে, তার ভাষায়, তার প্রকাশ ভঙ্গীতে, তার নিয়তের মূলে সবই জাহেলিয়াত, তাতে ইসলাম নেই। আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের কাহিনীতে আমরা অহরহ এসব অন্যায় এবং প্রতিবাদ দেখতে অভ্যস্ত!

ইসলামী কাহিনীতে চরিত্র মোতাবেক শিল্পী নির্বাচনের পদ্ধতিও ভিন্ন। যাকে 'কাস্টিং' বলা হয়। শিল্পী নির্বাচনের ব্যাপারে শুধু চরিত্র মোতাবেক চেহারা বা বয়স দেখলে হবে না, তার ব্যক্তি ইমেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কারণ চলচ্চিত্রের ও নাটকের কাহিনীতে যা বলা হচ্ছে তার আবেদন যতটা কল্যাণময় এবং আকর্ষণীয় মনে করা হয় কাস্টিং পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ না করলে উল্টো অকল্যাণ ডেকে নিয়ে আসবে। বর্তমান বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের দর্শক না থাকার কারণ এবং চলচ্চিত্রের আবেদন কমে যাওয়ার যত কারণ আছে কাস্টিং পদ্ধতি তার অন্যতম।

কাহিনীকারকে স্মরণ রাখতে হবে চলচ্চিত্রের যেকোন দিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল যে পাঁচটি মূল সূত্র, সেই 'ফাইভ ডব্লুউ-কে। তাকে স্মরণ রাখতে হবে তিনি কোন সমাজে বসবাস করেন। ১. হয়ার (Where) সেই সমাজের তিনি কে? ২. 'হু' (Who) একটি সমাজের সত্যিকার ব মুসলমান হিসেবে সমাজের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি কি রকম? অর্থাৎ তিনি কি রকম? ৩. What (হোয়াট). তিনি যে সময়ের কথা বলছেন, যখন বলছেন- ৪. হোয়েন When. তিনি কেন বলছেন? ৫. হোয়াই Why এই পাঁচটি ডব্লুউ এর মালাটা সদা-সর্বদা তার মনে অন্তরে, মস্তিষ্কে বিচরণ করবে।

রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক, আইন এবং সংস্কৃতির সকল দিক যদি ইসলামী আদর্শে পরিচালিত হয়, তবে সে সমাজের মানুষের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ ও চাহিদার কারণেই তা হবে। তখন তাদের রুচিবোধ, পছন্দ-অপছন্দ, বিচারবোধ, নৈতিকতা মোটকথা মানসিক খোরাক বলতে যা বুঝায় তার সবকিছুই হবে অত্যন্ত পবিত্র, উপাদেয় এবং উপকারী। কুয়োভর্তি সাপের মুখে পড়লে ব্যক্তির যে অবস্থা হয়, একজন গীবতকারীর সামনে পড়লে একজন মুসলমানের অবস্থা তাই-ই হবে। জাহেলিয়াত সমাজে মেয়েদের অশ্লীল নাচ দেখে যে ব্যক্তি আনন্দ পায়, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী সমাজে বসবাস করে তবে উক্ত নাচকে তখন সে ঘৃণা করবে বরং একজন বিধবা রোগগ্রস্ত অসহায় ক্ষুধার্ত মহিলাকে একবেলা খাওয়াতে পেরে, তাকে মায়ের সম্মান দিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে পেরে সে ব্যক্তি বেশি আনন্দ লাভ করবে। বৃদ্ধ মা-বাপকে হাত ধরে

www.bjilibrary.com

বাগানের মধ্যে বা রাস্তায় একটু হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়ালে সে যে আনন্দ পাবে, দামী হোটেলে হৈহুল্লোড় করে, বন্ধুদেরকে মাতিয়ে দিয়েও সেইরকম আনন্দ সে পাবে না। টিভি পর্দায় আল্লাহপাকের সৃষ্ট, সৌন্দর্যে আবৃত পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তুর জীবনাচরণ দেখে সে আনন্দ পাবে যত, তত আনন্দ ব্যান্ডসঙ্গীত বা সুন্দরী প্রতিযোগিতা দেখে পাবে না। এই হলো ইসলাম। তার সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, নৈতিকতা- সেখানে মানবিকতা ছাড়া আর কিছুই নেই। মানুষ এবং মানবিকতাই ইসলামের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ক্যামেরা উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতেই পৃথিবী, রাষ্ট্র এবং সমাজের দিকে তাকাবে। জড়বাদী অসুস্থ দৃষ্টিতে সে তাকাবে না। তাদের দৃষ্টি বৈধকে অবৈধ এবং অবৈধকে বৈধ হিসেবে দেখে। তারা মানসিকভাবে অসুস্থ। কারণ "তোমার জিনিস আমার দরকার, পছন্দ হয়েছে- অতএব আমি নেব।' এই বুদ্ধি ব্যয় করতে করতে তাদের বুদ্ধিভ্রম ঘটে। সুদ, লটারি থেকে শুরু করে নারীর সৌন্দর্য, সন্ত্রাস নিয়ে ব্যবসা করে তারা। বর্তমান পৃথিবীকে তারা অবৈধ, অশ্লীল, নিষ্ঠুর এবং মনস্তাত্ত্বিক সন্ত্রাসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে যত তার চেয়ে কৌশলগতভাবে তারা অন্যের জিনিসকে নিজের করে নেয়। ইসলামী চলচ্চিত্রের ক্যামেরার চোখকে তাই আরো বেশি সজাগ ও তীক্ষ্ণ হতে হবে। তাকে অবনত, লজ্জাশীল, সংযমী এবং মানবিক হতে হবে। ইসলামী চলচ্চিত্রের কাহিনীতে যে চরিত্র সৃষ্টি করা হবে, সে চরিত্র যেন অমিতাভবচ্চন, দীলিপ কুমার সৃষ্টি না করে। কারণ এই ধরনের স্টার ইমেজ ইসলাম গ্রহণ এবং স্বীকার করে না। তার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে, বহুবিধ ব্যবস্থা আছে সে ব্যাখ্যার উপযুক্ত স্থান এই প্রবন্ধ নয়, তাই সে বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রোয়জন। তবে এটা ঠিক, যে মুখ সত্য আদর্শ প্রচার করে সেখানে মুখের চেয়ে আদর্শই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বলে আদর্শই হয় স্টার। মুখ নয়, তবে সত্য আদর্শ যদি ব্যক্তি নিজে যথাযথভাবে আমল করে সে ব্যক্তি স্টার হবে তাতে আপত্তি থাকতে পারে না। ইসলামী চলচ্চিত্রের কাহিনী যদি সাহাবা কেরাম (রা) দের মত স্টার ইমেজ সৃষ্টি করতে পারে, আর শিল্পী যদি সর্বাঙ্গীনভাবে উত্তীর্ণ হয় তো ভালো কথা।

ইসলামী কাহিনীর চরিত্রগুলি উৎপাদন করবে, প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করবে, আবিষ্কার করবে, গবেষণা করবে, অর্থনীতিবিদ হবে, বিচারক হবে, সবই হবে সে মানবকল্যাণে যথার্থ ইসলামী পন্থায়। কারণ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং পরকালের মুক্তির জন্যই সে ইহকালের সকলপ্রকার প্রযুক্তি ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করবে। ইসলামী সমাজের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, মানবিকতা, নৈতিকতা, অর্থনৈতিক পদ্ধতি, এক কথায় সবকিছুর রূপই আলাদা। সে সমাজের বিচারের দরজায় পৌছাতে মানুষকে অযথা পুলিশ, উকিল ও অর্থনৈতিক হয়রানির শিকার

www.bjilibrary.com

হতে হয় না। সে তার বিচার অনায়াসে যাতে পায় ইসলাম তার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। জাহেলিয়াত সমাজে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমন একজন উকিল এই আশা নিয়ে বসে থাকে, যেন সে বলছে, 'এসো আমার কাছে, আমাকে টাকা দাও আমি তোমার অন্যায়কে ন্যায় করে দেব...।' এই যে করুণ, অমানবিক, অনৈতিক ব্যবস্থা এটা ইসলামী রাষ্ট্রে নেই, সেখানকার বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার চিত্র হিসেবে চলচ্চিত্রের কাহিনীর উপাদান, উপকরণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন, জাহেলিয়াত সমাজে বসে সেই আঙ্গিকের কাহিনী রচনার অর্থ একেবারেই নেই এবং তার কোন মানে নেই, প্রয়োজন নেই। তা ইসলামীও হবে না কখনো। জাহেলিয়াত সমাজে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে কাহিনীকার বসবাস করেন সেই কথা স্মরণ রেখেই তাকে কাহিনী রচনা করতে হবে। তাকে সামনে রাখতে হবে, কারা তারা দর্শক, কাদের জন্য সে কাহিনী লিখছে।

রাসূল (সা.) জালেহিলয়াত সমাজের মানুষকে ঈমান, তৌহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের দাওয়াত দিয়েছিলেন। সে দাওয়াত শুধু মুখে নয়, তার চাল-চলন, আচার-আচরণ, লেন-দেন, বিচার পদ্ধতি, সহ্য ও ধৈর্যশীলতা, ভাষার মাধুর্য এবং সর্বাঙ্গীন উৎকৃষ্ট নৈতিকতা প্রদর্শন করে। চলচ্চিত্র সমস্ত সংস্কৃতির আধার। অতএব রাসূল (সা.)-এর সংস্কৃতিকে পূর্ণভাবে অনুসরণ করে চরিত্র সৃষ্টি করা যেতে পারে। কাহিনীর চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সংলাপ, তার উপস্থাপনা সবই রাসূল (সা.)-এর আদর্শকে অনুসরণ করবে। বিপরীত দিকে বর্তমান নামধারী মুসলমানদের চরিত্র, ইসলাম বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানবোধ, মানসিকতা এবং তার বিশ্লেষণ কাহিনীর মধ্যে করা যেতে পারে।

স্পষ্ট ভাষায় বলা যেতে পারে যে, বর্তমান জাহেলিয়াত সমাজে একমাত্র দাওয়াতী কাহিনী নির্মাণ ও সেই অনুযায়ী চলচ্চিত্র তৈরিই যুক্তিযুক্ত। আর সত্যিকার মুসলমান চরিত্রে যারা অভিনয় করবেন তাদের ব্যক্তিগত আমল যেন সত্যিকার মুসলমানের মতই হয়। কারণ অভিনীত চরিত্র ও ব্যক্তি চরিত্রের সামঞ্জস্যতা বিধান না হলে অর্থাৎ কথা ও কাজের গরমিল হলে দর্শক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগবে। দর্শকের সঙ্গে প্রকাশ্যে প্রতারণ করা হবে। আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হবে। অতএব কাহিনীর চরিত্র হিসেবে চলচ্চিত্রের কাস্টিং পদ্ধতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

দীর্ঘ আলোচনার শেষে শুধুমাত্র 'দাওয়াতি' কাহিনী নির্মাণ করা যেতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রবন্ধের প্রথমদিকে যে চার প্রকার কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে, সেই চার প্রকার কাহিনীই নির্মাণ করা যেতে পারে। শুধুমাত্র প্রেম ও সঙ্গীতাশ্রয়ী, মারদাঙ্গা এবং পোশাকী কাল্পনিক ধরনের কাহিনীগুলো বাদে। বরং এর বিপরীতে কিশোর কিশোরীদের উপযুক্ত কাহিনী নির্মাণ করা যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

গবেষণামূলক কাহিনী, দুর্গম পার্বত্য অভিযানের কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যেতে পারে। তবে, জীবন কাহিনী (তথা রাজনৈতিক, যুদ্ধ, ইসলাম প্রচার) ঐতিহাসিক সামাজিক কাহিনী যেখানে ইসলামের বিচার পদ্ধতি, ন্যায়বিচার, সুদের মন্দ যত দিক, ইত্যাদি আসতে পারে। বর্তমান সমাজে যে সব মুসলমান ইসলামী দাওয়াতী কাজে অংশ নিচ্ছেন তাদের শিক্ষার্থে, তাদের অভিজ্ঞতা, করণীয় তাদের উপস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে। মোটকথা, ইসলামের অজস্র শিক্ষণীয় দিক আছে, সে সব বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে কাহিনীর মাধ্যমে। ইসলাম যে ব্যাপক চিন্তার ক্ষেত্র অবারিত করে রেখেছে তার সবটাই ক্যামেরা দিয়ে দেখা সম্ভব। জাহেলিয়াত পন্থীরা এবং তাদের চিন্তাধারা এক জায়গায় বন্দি হয়ে আছে, সংকীর্ণ নোংরা ছোট্ট গলি মুখে তারা আটকে আছে, তাতেই তারা অজস্র কাহিনী রচনা করছে। সে ক্ষেত্রে ইসলাম এত ব্যাপক এত বিশাল, কেউ যদি সম্পূর্ণ জাহেলিয়াতকে ঝেড়ে ফেলে ইসলামী চেতনায় ও জ্ঞানে সঙ্গী হতে পারে তবে সে লেখকের দ্বারা হাজার হাজার ধরনের কাহিনী লেখা সম্ভব। রাসূল (সা.) তৌহিদ, রিসালত ও আখেরাতের দাওয়াত দিয়েছেন। অপরদিকে সেই সময় মদ্যপানের আসর বসতো তাবুর মধ্যে অথবা কাঁচা ইটের ঘরে বসে অথবা প্রকাশ্যে। কিন্তু ঐ একই বস্তুর আসর আজ বসে বড় বড় হোটেলে, বারে এবং ধনী এলাকার বিলাসবহুল বাড়িতে। সে যুগে মুশরিকরা লুট করতো তীর-ধনুক, বর্শা হাতে, এখনকার সমাজে বড় বড় অফিস-আদালতে লুণ্ঠন হয় কলমের কালির আঁচড়ে। সে যুগে এমন কি তারও আগে ঈসা (আ.)-এর সময়েও ব্যভিচারী ব্যভিচারিণী বা পতিতাদের প্রকাশ্য পরিচয় ছিল, সেই একই রূপে আজকের সমাজে বিভিন্নরূপে, প্রতারণার সাজে তারা সমাজে ঘুরছে, সমাজের ক্ষমতাধরদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিন্তু একটা স্থানে পার্থক্য হলো, আজকের মানুষগুলো কাফের ও মুশরিক নয়, মুসলমান। সে যুগে যেমন ধাঁচের নাচ গান হতো, আজকের যুগে তা দু'টি ভাগ হয়ে একটি হয়েছে নাচ-গান অন্যটি হয়েছে সুন্দরী প্রতিযোগিতা। বরং তখনকার যুগ থেকে এখনকার জাহেলিয়াত বড্ড বেশি অন্ধকার। তাই সত্যিকার মুসলমানদের জন্য দাওয়াতি কার্যক্রম এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রাণান্ত চেষ্টা করা আরো বেশি প্রয়োজন। সে সময় মুশরিকদের অনুষ্ঠিত মদপান, নাচ-গানের আসর, জুয়া-লটারি, অবৈধ ব্যভিচার, লুটপাটের মত সমস্ত আনন্দকে ত্যাগ করে সত্যিকার বুদ্ধিমান মানুষগুলো রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন, একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। উপরন্তু তাদের প্রাণের ওপর এসেছিল হুমকি, জীবন দিয়ে ছিলেন তারা, নির্যাতিত হয়েছিলেন- তবুও ঐ নাচ-গান, মদ্যপান আর আনন্দদায়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের লোভে তারা পড়েননি। এক এক করে পর্দা ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন, সুদ ত্যাগ করেছিলেন, সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তু ত্যাগ, করেছিলেন এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছিলেন, জীবন উৎসর্গ করে।

www.bjilibrary.com

কিন্তু আজকের সমাজে সেইসব মহান সাহাবী (রা.) দের মত নির্যাতনের ভয় নেই, খাওয়া-পরারও যে খুব বেশি ঝুঁকি আছে তা বলা যায় না। পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই- এ সবেরও ঝক্কি-ঝামেলা নেই, তাই অনেক চিন্তা, দুঃখ, যন্ত্রণা থেকে আমরা মুক্ত। অতএব সেই সময়টুকু আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবলেও তো শত শত কাহিনী মানসপটে ভেসে উঠবার কথা যা দাওয়াতি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন।

রাসূল (সা.) এর সময় প্রতিভাধর নামকরা কবিদের কাব্য প্রতিযোগিতা হতো। তারা যখন আবেগ দিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতেন তাদের চোখেমুখে অভিব্যক্তি ফুটে উঠতো, দেহভঙ্গিতে থাকতো সেই অভিব্যক্তি। রাসূল (সা.) মৌখিক ও দৈহিক অভিব্যক্তি প্রকাশে বাধা দেননি। তাহলে তো কবিতার মূল আবেদনই থাকে না। তখন যদি ক্যামেরা থাকতো তবে কি সেই কবিতা আবৃত্তিকে আমরা অভিনয় বলতাম? অবশ্যই বলতাম। বলতাম, 'আহ্ কি সুন্দর অভিনয় করেছেন, বাস্তব অভিনয়, একেবারে কেঁদে ফেলেছেন, অমুক জায়গায় চোখমুখ দিয়ে যেন রক্ত ঠিকরে বের হয়েছে...।'

কিন্তু প্রশ্ন হলো তারা কবিতার ভাষায় কি বলতেন? আমাদের আলোচ্য কাহিনীকারকে কবিতার সেই আদর্শকে স্মরণ করতে হবে। কাহিনীর প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে- 'যা আল্লাহর স্মরণকে ভুলিয়ে দেয় তাই-ই বিদায়াত'- এই হাদীস প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুগকে ব্যক্ত করতে বলা হয়নি, জাহেলিয়াতকে ভেংচি কাটতে বলা হয়নি, তাদের 'সত্য' জানাতে বলা হয়েছে, মিথ্যাকে বর্জন করতে বলা হয়েছে।

বর্তমান মানুষ পড়ার চেয়ে দেখে শিখতে ও জানতে ভালোবাসে। ইসলামী কাহিনীর রচয়িতাদেরকে তাই দেখানোর ব্যাপার অত্যন্ত সুচিন্তিত ও মর্যাদাকরভাবে পেশ করতে হবে।

ইসলামী কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করে সিনেমা হলে প্রদর্শিত হলেই যে দর্শক হুমড়ি খেয়ে পড়বে না, একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দর্শক তৈরি করতে হবে। তার পদ্ধতি আছে, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি মোতাবেক অগ্রসর হলে ইনশাআল্লাহ ইসলামী চলচ্চিত্র একদিন সমাদৃত হবে এবং মানুষের জন্য উপকার ও কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে।

কাঁচামালের নৈকট্য শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। ফুলবাগানে ফুলের নৈকট্য- সেখানে বসে বিভিন্ন ফুলের মালা গাঁথা সহজ। বহন করার কষ্ট. ও খরচ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পাথরের স্তূপের মধ্যে বসে পাথর ভাঙ্গা সহজ- বহন করার ঝক্কি-ঝামেলা অনেক। ঠিক তেমনি শতশত বছর ধরে নিষ্ক্রিয় থাকা

www.bjilibrary.com

এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় না থাকার কারণে ইসলামী সংস্কৃতির সমস্ত উপাদান উপকরণ মানুষের 'নৈকট্য' থেকে দূরে চলে গেছে। সাধারণ মানুষের জন্য সেসব বহন করার মধ্যে মানসিক তৃপ্তি নেই। সে স্থানে জাহেলিয়াত প্রদত্ত সংস্কৃতির উপায়-উপাদান এক্কেবারে হাতের মুঠোয়। মানুষ তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর তাতেই আনন্দ ও তৃপ্তি পায়। কিন্তু তা যে কত বীভৎস, ক্ষতিকারক, ধ্বংসকারক এ চোখে দেখা যায় না বলে মানুষের বুঝে আসে না। যেমন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শ্রোতার হৃদয়ে যাদুক্রিয়া করে, তার চিন্তাধারা থেকে সৃজনশীলতা কেড়ে নেয়। তাকে বিষণ্ন করে দেয়, হঠাৎ, রাগ হয় পরক্ষণে শান্ত হয়ে যায়। বাদ্যযন্ত্রের এই বিষের মত ক্রিয়াকে চোখে দেখা যায় না এবং শ্রোতাও অনুভব করতে পারে না বিধায় বাদ্যযন্ত্রের এই ক্ষতিকারক দিকটার কথা স্বীকার করে না। কিন্তু ইসলাম একে নিষিদ্ধ করেছে। মদ যেমন মাতলামী দাবি করে, অশ্লীল চলচ্চিত্র বা দৃশ্য যেমন ব্যভিচার দাবি করে, স্বার্থপরতা যেমন নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়, সুদ যেমন মানুষকে হৃদয়হীন করে, নাস্তিক্যবাদ যেমন সভ্যতার পোশাক খুলে দেয় তেমনি জাহেলিয়াত প্রদত্ত সবকিছুরই গায়েবি ক্রিয়া আছে এবং প্রচলিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের শৃঙ্খল না থাকলে এসবের অনেক প্রকাশ্য ক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ মানুষকে এসবের প্রত্যক্ষরূপ দেখাতে হবে ইসলামী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে।

কিন্তু যেহেতু 'নৈকট্য' ব্যাপারটা অনেক দূর, সেহেতু গভীর চিন্তা-ভাবনা অনুশীলন, কষ্ট ও পরিশ্রম করে ফেরিওয়ালার মত মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে মানুষের হাতে তা তুলে দিতে হবে। মানুষের যখন ভুল-ভাঙ্গবে তখন মিথ্যাকে ছুঁড়ে ফেলে সত্যকে সে অবশ্যই বুকের মাঝে স্থান দেবে। এখন প্রয়োজন হলো ইসলামী কাহিনীর আলোকে নির্মিত চলচ্চিত্র মানুষের দ্বারে পৌছে দেয়া। 'নৈকট্য' প্রাপ্তি ঘটানো। তাহলে ইসলামী সাহিত্য যেভাবে আদরণীয় হচ্ছে, চলচ্চিত্রও তেমনি আদরণীয় হবে। আর একটা আদরণীয় হলেই এতদিন যা আদরণীয় ছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে প্রথমে আসে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা। চলচ্চিত্রিক সংগঠন ও তার কার্যাবলী:

সংগঠন প্রথমেই যা করবে তা হলো- প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যোগ্য লোক তৈরি করা।

প্রশিক্ষণের বিষয়

১. কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনার প্রশিক্ষণ।

২. ক্যামেরা, লেন্সের ব্যবহার ও লাইট প্রসঙ্গ।

৩. সম্পাদনা।

www.bjilibrary.com

৪. অভিনয়।

৫. সনদ প্রদান।

প্রয়োজনীয় বস্তু-

১. কিছু নির্দিষ্ট বিদেশী ছবি সংগ্রহ। যা পুনঃ সম্পাদনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেখাতে হবে।

২. পোর্টেবল প্রজেক্টর, ৩৫ মি.মি।

৩. ক্লাস রুম।

৪. ৩৫ মি.মি ক্যামেরা, বেটা ক্যামেরা ও ৫টি লাইট, রিফেক্টর বোর্ড। লাইট : পাজ্রা, সোলার, বেবী ও ডিক্কি এবং সানগান। ৫. জুম লেন্স এবং বিভিন্ন লেন্স ও ফিল্টার। বিশেষ করে ১৬, ১৮, ২৪, ২৮, ৩০ ৩৫, ৪০, ৫০ এসব পয়েন্টের লেন্স।

৬. সম্পাদনা মেশিন ও একটা রুম।

৭. ট্রলি।

৮. কম্পিউটার এডিটিং সরঞ্জাম।

৯. নেগেটিভ ফিল্ম, পজেটিভ, সাউন্ড নেগেটিভ, ম্যাগনেট ইত্যাদি।

উল্লেখ্য এর সবগুলো ভাড়া নিয়েও কাজ করা সম্ভব চলচ্চিত্রের ক্যাটাগরি-

১. পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ।

২. স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

৩. ডকুমেন্টারি।

শিক্ষার্থীরাই ২ ও ৩ ক্যাটাগরির চলচ্চিত্র নির্মাণ করবে পরীক্ষামূলকভাবে। তাদেরই রচিত কাহিনীর আলোকে, যা বাছাই কমিটি দ্বারা স্বীকৃত। সাংগঠনিক উপায়ে অর্থের যোগান দিতে হবে। সংগঠনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রদর্শিত হবে উক্ত চলচ্চিত্র। তার জন্য প্রয়োজন- জেনারেটর এবং পোর্টেবল প্রজেক্টর ৩৫ মি.মি।

বছরে একবার স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব করতে হবে, আন্তর্জাতিক- ভাবে।

পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবির জন্য দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করতে হবে। যাতে সিনেমা হলে, নামাজের সময় বিঘ্নিত না হয় এবং সিনেমা হলে সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে পরীক্ষামূলকভাবে।

www.bjilibrary.com

উপকার

১. দর্শক সৃষ্টি হবে।

২. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রশাসকদেরকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত ছাড়াও ইসলামী দায়িত্বশীলদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ হবে।

৩. যারা শিল্পী হিসেবে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হচ্ছে তাদেরকে অর্থনৈতিক মূল্যায়নের আওতাধীন করা সম্ভব হবে।

৪. ধীরে ধীরে সিনেমা হল সংগঠিত হবে, শো টাইমের পরিবর্তন হবে এবং হলের পরিবেশ ইসলামসম্মত হবে।

যেহেতু চলচ্চিত্রকে 'চলচ্চিত্র জগৎ' বলা হয়, সেহেতু অনুমান কমায় যে জগৎটা আসলেই ব্যাপক। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর সব সমাধান সম্ভব নয় বিধায় সবকিছুর ব্যাখ্যা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব হলো না। তবে অনতিবিলম্বে ইসলামী ঐতিহ্যে চলচ্চিত্র তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে জড়বাদী ও নাস্তিক্যবাদীর ছোবল আরো বিষাক্ত হয়ে উঠবে বলে মনে করি।

www.bjilibrary.com

ইসলামী চলচ্চিত্র আন্দোলন

১৬৪৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী 'অ্যাথানাসিউস্ কিরখের' আবিষ্কার করেছিলেন 'ম্যাজিক লণ্ঠন'। স্বচ্ছ একটা মাধ্যমের ওপর ছবি এঁকে সেটাকে লেন্সের ভিতর দিয়ে পর্দায় প্রতিফলিত করাই এই ছবি প্রদর্শনের আসল কায়দা। ক্যামেরা বা ফিল্ম আবিষ্কার করার আগে এভাবেই প্রজেক্টর মেশিনের আদি সংস্করণ শুরু হয়। এরপর সমগ্র ইউরোপজুড়ে নানাভাবে গবেষণা হয়। সে ইতিহাসের অবতারণা এখানে অবান্তর। শেষাবধি ১৮৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে ফরাসি দু'ভাই অগুস্ত লুমিয়ের [১৮৬২-১৯৫৪] এবং লুই লুমিয়ের [১৮৬৪-১৯৪৮] আর্কল্যাম্প প্রজেক্টর দিয়ে প্যারিসেই প্রথম নিজেদের তৈরি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। এরপর একে একে বৃটেন, রাশিয়া ও আমেরিকায় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এর প্রায় ছয় মাস পরে ১৮৯৬ সালের ১৭ মে মুম্বাইয়ের ওয়াটসন হোটেলে লুমিয়ের গ্রুপের উদ্যোগে উপমহাদেশে প্রথম চলচ্চিত্র দেখানো হয়। ১৮৯৬ সালে ১৪ জুলাই মুম্বাইয়ের নভেল্টি থিয়েটারে নিয়মিত চলচ্চিত্র দেখানো শুরু হয়। এই হলো উপমহাদেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। চলচ্চিত্র আবিষ্কার এবং প্রদর্শনীর সময়টাতে উপমহাদেশে [সমগ্র বিশ্বেও] মুসলিম জনগোষ্ঠির অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। খ্রিস্টান ও বর্ণবাদী ব্রাহ্মণদের শাসন, হিন্দুদের উপর খ্রিস্টান শাসকের পক্ষপাতিত্ব এবং সর্বস্তরে শোষণ, বঞ্চনার মধ্যদিয়ে মুসলিম জাতিকে ধ্বংসের প্রায় শেষ সীমানায় পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। মুসলিম জাতি তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, আত্মসমৃদ্ধির দরজায় তার কোনোভাবে উঁকি দেবার সুযোগ ছিল না।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা-দীক্ষা, উচ্চশিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রকার গবেষণা থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠি সরে গিয়ে বিভিন্ন পীর সাহেবের খানকায় গিয়ে শিষ্যত্বের চাদরে আত্মগোপন করে। তখন যত পীর ততভাগে মুসলিম জনগোষ্ঠি বিভক্ত হয়ে পড়ে।

www.bjilibrary.com

অথচ এই সময়টিতে উপমহাদেশের হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠি তাদের বৈষয়িক এবং মানসিক সংস্কৃতির ব্যাপক উত্তরণ ঘটায়।

চলচ্চিত্র ১৯২৭ সাল অবধি ছিল নির্বাক। ১৯২৭ সাল থেকে চলচ্চিত্রে প্রথম শব্দ প্রয়োগ পদ্ধতির শুরু হয়। নতুন মাত্রা পেয়ে চলচ্চিত্র একক, বৃহত্তম বাণিজ্যিক বিনোদন মাধ্যম হিসেবে উপমহাদেশে ঠাঁই করে নেয় এবং দর্শকদের সামনে বিনোদনের বিপুল উপাদান নিয়ে প্রতি মুহূর্তে হাজির হতে থাকে। বিভিন্ন রাজ্যের রাজা, রাজপুত্র এবং জমিদার শ্রেণী চলচ্চিত্র ব্যবসায় অর্থ লগ্নি করতে থাকে। তারা গড়ে তোলে স্টুডিও, ল্যাবরেটোরি, স্যুটিং স্পট। নতুন নতুন প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হয় উপমহাদেশের প্রায় সব শহরে।

অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত, দল ছাড়া, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিষ্পেষিত অথচ প্রতিভাদীপ্ত মুসলিম সাহিত্যিক, কবি, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, পরিচালক এবং অভিনয় শিল্পীরাও তাদের সমস্ত পাণ্ডিত্য, মেধা, প্রতিভা, চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে অনৈসলামিক পন্থায় এবং শিরক ও জাহেলিয়াতের চূড়ান্ত সব সৃজনশীলতার জোগান দিতে থাকে, সমৃদ্ধ করতে থাকে জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারী উপমহাদেশের একমাত্র বিনোদন মাধ্যম চলচ্চিত্র শিল্পকে। এক পর্যায়ে মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগত গড়ে ওঠে-এম, বশির মাহমুদ সাহিত্যরত্ন, রাজা মেহেদী আলী খাঁন, জানেসার আখতার, রফিক গজনবী, শাকিল বাদাউনি, নৌশাদ, ইসমাত চুগতাই, আনোয়ার কামাল পাশা, আখতার শিরানী, মেহবুব খান, কে আসিফ, খাজা আহম্মদ আব্বাস, কামাল আমরোহীদের মত মুসলিমদের অমুসলিমপন্থায় জ্ঞানের ব্যবহারে এবং সহযোগিতায়।

মুসলিম জনগোষ্ঠির প্রতিভাদীপ্ত কবি-সাহিত্যিকরা তাদের নিজস্ব জীবনবিধান তথা পবিত্র কোরআন, হাদীস, সুন্নাহ্ এবং তাদের আপন সংস্কৃতিকে পাশ কাটিয়ে জাহেলিয়াত এবং শিরকবাদকে সমৃদ্ধ করেছে। ভুলে গেছে জাতি হিসেবে তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে।

অন্যদিকে পীর সাহেবরা একজনের মুরীদ হলে আর এক পীরের মুরীদ হওয়া জায়েজ নয় এই ফতোয়া জারী করে বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠিকে বিভক্ত করে বিভিন্ন পীরের দলে এবং তাদের খানকায় আবদ্ধ করে রেখেছে। এই ফাঁকে ওই সব মুসলিম কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা অসংগঠিত অবস্থায় তাদের প্রতিভা উজাড় করে দিয়ে শক্ত করেছে শিরক ও জাহেলিয়াতের শিকড়। শিরি-ফরহাদ, লাইলী-মজনু, হাতেম তাঈ, সোহরাব-রুস্তম-এর গায়ে শ্রীকৃষ্ণ-রাধার অবৈধ-অশ্লীল প্রেমের রঙ ছড়িয়ে সে সব কাহিনীকে বিভিন্ন শাখায় বিচিত্র সব উপাদানে ভরপুর করে একের পর এক সব চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে, তৈরি হয়েছে সংগীত। যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে অবৈধ প্রেম উদ্বুদ্ধকরণে এবং অবৈধ সম্পর্ক উৎসাহিতকরণে।

www.bjilibrary.com

উক্ত দুটি মূল লক্ষ্যকে পুঁজি করে হাজার হাজার চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ গান তৈরি হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো অবৈধ প্রেম ও অবৈধ সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান। সব চলচ্চিত্র ও সংগীত উৎসাহিত ও সমর্থন করেছে হিন্দু পৌরাণিক প্রেম-কাহিনীর মূল বিষয় অবৈধ প্রেম ও অবৈধ সম্পর্ক।

সমগ্র মুসলিম জাতি তাদের মন-মস্তিষ্কে এবং চিন্তায়-চরিত্রে ঐ একই ভাবধারার প্রলেপ মেখে বিভ্রান্ত হয়েছে। এইভাবে মুসলিম তরুণদের ও প্রতিভাবানদের চিন্তা-চেতনা থেকে সৃজনশীলতা লুপ্ত হয়েছে। আর চলচ্চিত্র নামক আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানকে এবং তার বাস্তবতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে নিজেদের সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম সিংহদরজাটি চিরতরে তালাবদ্ধ করে রেখেছে।

এমতাবস্থায় একটা বিশাল মিথ্যার পাথর চাপা দেবার প্রচেষ্টা চলেছে যা আজও চলছে, তাহলো এই যে, ইসলাম মানুষের চিন্তার বিকাশ ঘটতে দেয় না বরং নানান বাধ্যবাধকতা আরোপ করে ইসলাম মুসলিম জাতির মননশীলতা, চিন্তা-ভাবনা এবং চেতনাকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। এই অপবাদ আরোপের আরো কারণ হলো, চলচ্চিত্রের সেই উৎকর্ষের যুগে, পৃথিবীর বেশ কিছু উন্নত দেশে চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক ব্যাপক আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়ালো এবং সফল হলো। কিন্তু সেখানে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক বলে দাবি করে তারা অর্থাৎ মুসলিমরাই অনুপস্থিত।

চলচ্চিত্র যে রীতিতে চলে আসছিল সেই রীতি সমাজ বিধ্বংসী ছিল বলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে ফ্রান্সেই। ১৯২৩ সালে সেই নির্বাক যুগে। আন্দোলনটি ১৯৩২ সাল অবধি চলে। এই আন্দোলনটির নাম ছিল "আভা গার্দ" আন্দোলন। এই আন্দোলনের দুটি দিক ছিল- এক. চলচ্চিত্রের প্রথাগত রীতি থেকে বেরিয়ে আসা। দুই. ফটোগ্রাফির দৃষ্টিকোণে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা। অর্থাৎ যে ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে চলচ্চিত্রের কাহিনী তৈরি করা হয় তাকে বদলে দিয়ে সমাজ হিতৈষী বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করা এবং সঙ্গত কারণেই তখন ক্যামেরার ফ্রেমিং-কম্পোজিশান পরিবর্তন করা দরকার, সেটা করা। আর আসলেই এতে চলচ্চিত্রে নতুন বিষয় ও ভাবধারার সৃষ্টি হলো। ১৯৩২ সালের পর চলচ্চিত্রে আরো পরিবর্তন সূচিত করার জন্য "নিও-রিয়ালিজম"-এর উদ্ভব হয়। এই আন্দোলনকারীদের শ্লোগান ছিল, "Take the camera out into the streets." এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কঠোর বাস্তবতাকে সেলুলয়েডে তুলে ধরা। মানুষের প্রাত্যহিক উত্থান-পতন, মানবিক মূল্যবোধ, মানুষের চেতনার জাগ্রত প্রকাশ ইত্যাদি।

এরপর বৃটেনে একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। "ফ্রি সিনেমা"। তাদের বক্তব্য ছিল, 'আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবনের বস্তুপুঞ্জের অবিকল অনঢ়

www.bjilibrary.com

প্রতিচ্ছবিটাই বড় কথা নয়, তাকে কেন্দ্র করে নিজেদের প্রয়োজন মতো জীবনের সত্য খুঁজে বের করতে হবে। ১৯৫৬ সালে এই 'ফ্রি সিনেমা' আন্দোলন শুরু হয়। ততদিনে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামের মুসলিম দেশ স্বাধীন হয়েছে। এরও আগে সাদাকালো ছবিতে রঙের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ১৯৫০-এ চওড়া পর্দার [Wide screen] আবির্ভাব হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, পাকিস্তান আমলে প্রচলিত রীতির বাইরে ইসলামী সংস্কৃতি সমৃদ্ধ অথবা বিকল্পধারার চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক কোন আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠা তো দূরের কথা, কোনো আন্দোলনের সূচনাও হয়নি। যদিও ১৯২৩ সাল থেকে যেসব আন্দোলন ইউরোপে গড়ে ওঠে তার ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিখ্যাত সব নতুন ধারার চলচ্চিত্র, পরিচালক এবং নতুন টেকনিক বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে।

চল্লিশ দশকের শেষে ফ্রান্সে 'অথর থিওরী'র যুগ শুরু হয়। এদের বক্তব্য ছিল, 'শুধু লেখকের চিন্তার উপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র তৈরি না করে ঔপন্যাসিক, কবি, গল্পকার, নাট্যকারের মতোই চলচ্চিত্র পরিচালকেরও নিজস্ব বলার কিছু ব্যাপার আছে।' এই 'অথার থিওরী' পরবর্তীতে বিখ্যাত সব পরিচালক ও চলচ্চিত্রের জন্ম দিয়েছে।

এরপর ১৯৫৮-৫৯-এ 'নুভেল ভাগ্' আন্দোলন শুরু হয় ফ্রান্সেই। পাঁচজন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত একটা গোষ্ঠী এই আন্দোলনের সূচনা করেন এবং নেতৃত্ব দেন। 'নুভেল ভাগ্" আন্দোলন ফরাসী চলচ্চিত্রকে পরিবর্তন করে দেয়। বিশ্ববিখ্যাত অনেক পরিচালক এবং চলচ্চিত্র তৈরি হয় ঐ সময়ে। এইভাবে যুগে যুগে বিভিন্ন আন্দোলনের ফলে সূচিত পরিবর্তন চলচ্চিত্রকে একটা বিশেষ পর্যায়ে উপনীত করেছে।

উপমহাদেশের চলচ্চিত্র, আমাদের দেশজ চলচ্চিত্র এবং হংকং, হলিউডের উদোম চলচ্চিত্র দেখে বোঝার উপায় থাকে না যে চলচ্চিত্রও মানবিক হয়ে উঠতে পারে, সর্বজনীন এবং কল্যাণকর হয়ে উঠতে পারে।

উল্লেখিত আন্দোলনগুলির অবতারণার কারণ এই যে, উপমহাদেশে যেসব চলচ্চিত্র তৈরি হয় এবং সরকারি অনুমোদনে যেসব চলচ্চিত্র আমদানী করা হয়-তার সমস্ত অবয়বজুড়ে থাকে হিংস্রতা, বিবাহ বহির্ভূত অশ্লীল প্রেম এবং অবৈধ সম্পর্ক। বিশেষ করে যে বয়সটাতে সৃজনশীলতার ঝোঁক আসে, চিন্তার ব্যাপকতা আসে এবং চিন্তার বিকাশের একটা প্রবণতা জন্মায়, ঠিক সেই সময়টার সামনে বিচিত্র উপাদান, নানান সুর ও ছন্দের এবং নানান রঙের যে মিশ্রণ চলচ্চিত্রে দেয়া হয় তার বক্তব্য মাত্র একটাই, "অস্বাস্থ্যকর অনৈতিক আনন্দ"। এতে লিপ্ত করিয়ে তরুণশ্রেণীর মানসিক বৈকল্য ঘটিয়ে তাদের চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করা হয়। বিপরীত দিকে ইসলামী সংস্কৃতির যে ব্যাপকতা,

www.bjilibrary.com

বিশালত্ব, তার সাহিত্য, সংগীত, কাব্য এবং পবিত্র কোরআন ও হাদীস ভাণ্ডারে যে চিন্তার মহাসমুদ্র উপস্থিত তা থেকে ভুল বুঝিয়ে, অজ্ঞ রেখে, সংকীর্ণতার অপবাদ দিয়ে সমগ্র মুসলিম তরুণদের মন-মস্তিষ্ক থেকে মহান আল্লাহপাক ঘোষিত 'শ্রেষ্ঠ জাতি'- এই তত্ত্বটার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে এবং আজো নানা প্রকার মাধ্যমে বিলুপ্তি ঘটানোর চেষ্টা চলছে। তাই এই একশ বছর পরেও সিনেমাকে ইসলামী সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ করার কোনো প্রবণতা এবং আন্দোলনের সূচনা হয়নি। আর তাই বিজ্ঞানের এই কল্যাণময় আবিষ্কারকে মুসলিম প্রতিভার বিশাল একটা অংশ জাহেলিয়াতের সেবায় উৎসর্গ করেছে। ইসলামী কোনো জ্ঞান ছাড়াই মুসলিম নামধারীরা এই মাধ্যমটিকে ব্যবহার করেছে এবং করছে অমুসলিমদের অকল্যাণকর গতিধারায়। মাধ্যমটিকে মুসলিম জাতি এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহার করার অবদান এবং সাক্ষর রাখতে পারেনি। বরং দারুণভাবে অবজ্ঞায় অবহেলায় এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

চলচ্চিত্রিক ক্ষেত্রে মুসলিমরা তাদের আদর্শ, তাদের চিন্তা-চেতনা, আচার-ব্যবহারের প্রকাশভঙ্গি অমুসলিমদের মতো হয়ে গেছে, মুসলিম-অমুসলিম পার্থক্য নেই বললেই চলে। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলিমরা তাই আজ 'মুসলিম' শব্দটাকে বাঁকা চোখে দেখে এবং সার্বজনীন নৈতিকতাকে ডিঙিয়ে অমুসলিমদের মতো অমানবিক, স্বার্থপর, মিথ্যাশ্রয়ী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টিতে একজন মুসলিম হবে দরিদ্র, তার বিশেষ পোশাক থাকবে, সে ইঞ্জিনিয়ার হবে না, নেতা হবে না, বিচারক, গবেষক, ডাক্তার কিছুই হবে না, হওয়া সম্ভবও নয়, কারণ তার ধর্ম তার জীবন ও চিন্তা-ভাবনাকে মসজিদ ও মাদ্রাসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে বলেছে। বিয়ে পড়ানো, আরবী শেখানো, মিলাদ পড়ানো এবং মৃতের জানাজা পড়ানোই তার কাজ।

যদিও ইসলাম সম্পর্কে এই সংকীর্ণ, ভুল, মিথ্যে এবং জঘন্য ইমেজ চলচ্চিত্রের সৃষ্ট নয় বরং চলচ্চিত্র মুসলিমদেরকে এমন রূপেই চিত্রায়িত করে। যা জাহেলিয়াতের চিন্তাকে সমর্থন এবং শক্তিশালী করে। কিন্তু মুসলিমদের এই ইমেজ সৃষ্টির জন্য দায়ী কে! এক কথায় এর উত্তর- প্রতিষ্ঠিত মুসলিম নামধারী শাসকরা এবং তাদের শাসকসত্ত্বাকে দীর্ঘস্থায়ী করে থাকে তথাকথিত পীরদের খানকা ও তথাকথিত মাদরাসা শিক্ষা। এদের শিক্ষা হচ্ছে ইসলামের সর্বজনীন আইনগত পন্থা পালনে আর্থিক উন্নয়নকে বাতিল করে সীমাবদ্ধ কিছু মৌখিক কর্মপন্থায় আর্থিক অনুশীলন। অর্থাৎ ধুলা-বালি, ময়লা পরিষ্কারকে প্রাধান্য দেয়া, কিন্তু ওসবের উৎসমূল চিরতরে ধ্বংস করার পথে তারা ধাবিত হয় না। এই কারণে মুসলিম নামধারী ইসলামবিরোধী শাসকশ্রেণী, পীর সাহেব ও সেইসব মাদরাসা শিক্ষিতদেরকে হাতিয়ার করে মনের মত করে ধুলাবালি ও ময়লা

www.bjilibrary.com

উৎপাদনে অর্থাৎ ইসলামবিরোধী বিধান ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি নিয়োগ করার সুযোগ পায়। আর চলচ্চিত্র এই ভাবধারা ও ইমেজকে সমর্থন করে এবং পুষ্ট করে। কায়েমী স্বার্থপূজারী শাসকশ্রেণী তাই ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধেও সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে। চলচ্চিত্রের সর্বাঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকভাবে উক্ত বিষয়গুলো নানাপ্রকার মাল-মশলা দিয়ে সাজানো থাকে। সাধারণ মানুষের মনে তা গেঁথে যায় এবং তারাও ঐ একই পথে পরিচালিত হয়, তাদের কাছে ইসলামী বিধান কঠিন মনে হয়। আর এখানেই চলচ্চিত্রের বিপুল ক্ষমতা। অথচ সবারই জানা যে, ইসলামী বিধানকে যথাযথ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় জুলুমকে সমূলে উৎপাটন সম্ভব হয়ে ওঠে। আর রাস্তায় হাঁটলে ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করা যেমন সহজ হয় তেমনি তা সাহসও সঞ্চার করে, না হেঁটে শুধু মনে জিকির করলে সারাজীবনেও ইসলামী বিধানের রাস্তায় হাঁটার সাহস সঞ্চয় হবে না। শেখ শাদীর (র.) : যথার্থই বলেছেন, 'যে তরবারী দিয়ে ঘাস কাটে সে জীবনেও যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাহসী হয় না।' বাস্তবক্ষেত্রেও এটা প্রতীয়মান যে, আমাদের দেশে লক্ষ-কোটি মানুষ তবলীগের বয়ানে বা আখেরী মোনাজাতে অংশগ্রহণ করলেও আল্লাহর বিধানের বিরোধীতাকারীদের বিরুদ্ধে টু শব্দ করার হিম্মত হারিয়ে ফেলেছে।

মনে রাখা দরকার, চলচ্চিত্র মানুষের মনে নতুন কোনো প্রবৃত্তির সৃষ্টি করে না। চলচ্চিত্র দেখার পর কেউ মন পরিবর্তন করে না। এ পর্যন্ত এমন হয়নি যে চলচ্চিত্র দেখে একজন অহিন্দু হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে। অথবা একজন মুসলমান খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। বা একজন পুঁজিবাদী কমিউনিস্ট হয়েছে। আমাদেরকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, চলচ্চিত্র নিজে কোনো সংস্কৃতি তৈরি করে না। তাহলে চলচ্চিত্রের কাজ কি! চলচ্চিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো, সে সংস্কৃতির জোগান দেয়। তার লক্ষ্য হলো সে দর্শকের মনের রাজ্যে প্রভাব তৈরি করে। সে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে সমর্থন জোগায়, তার চিন্তাকে বলিষ্ঠ ও বলবান করে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কারগুলিকে জোরদার করে তোলে। যে কোনো অপ্রচলিত বিষয়ের প্রচলন ঘটায় অথবা অপছন্দের বিষয়কে সহনীয় করে তোলে এবং গ্রহণযোগ্য করে তোলে। অর্থাৎ ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ছাড়াও প্রায় প্রতিটি আইন-বিধানের জায়গায় এখন জাহেলিয়াত স্থান করে নিয়েছে, এখন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয়কে আমরা মানুষের কাছে প্রথমে সহনীয় এবং পর্যায়ক্রমে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারি।

মহানবী (সা.) যা বলেছেন তার অর্থ এরকম যে, 'মানুষ তার স্বভাব ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা বা পরিবেশ তাকে কুফরীর পথে ঠেলে দেয়।' তা হলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের কুফরী চিন্তা-চেতনাকে জাহেলী

www.bjilibrary.com

চলচ্চিত্র শক্তিশালী করছে। অথচ মহানবী (সা.) যে চিন্তা নিয়ে উক্ত কথা বলেছেন তা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের অনুসারীদের জন্য চলচ্চিত্র একটা বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সব মানুষই আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী হয়ে জন্মে। কিন্তু নানা মতবাদ, নানা সংস্কৃতি সেটা ঢেকে ফেলে, যার নাম কুফর। চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মনের নিভৃতে লুকিয়ে থাকা সেই একত্ববাদকে উসকে দেয়া এবং তাকে তাজা ও জীবন্ত করে তোলা। যাতে 'কুফর' নামক সেই ঢাকনী সরে যায়, মানুষ সঠিক জ্ঞান ফিরে পায় এবং বুঝতে পারে তাকে একদিন আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। মহানবী (সা.) সেই শাশ্বত বাণী নিয়েই এসেছিলেন। অর্থাৎ তাওহীদ, আখেরাত ও রিসালাতের সত্যতা ঘোষণা করাই হবে চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এর মানে এই নয় যে, প্রতিটি চলচ্চিত্রে শুধু এই ঘোষণাই দিতে হবে। 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেললে তাতে সওয়াব হয়'। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের ঘটনাপঞ্জিতে যা থাকবে তা হবে সবই মানবকল্যাণের জন্য। একটা চলচ্চিত্রে হয়তো কোথাও তাওহীদ, আখেরাত কিংবা রিসালাত সম্পর্কে কিছুই বলা হলো না, কিন্তু সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতি, মানুষের অমানবিক আচরণ অথবা কোন মন্দ বিষয়ের প্রতিবাদও ইসলাম বলে গণ্য হতে পারে। কারণ ইসলামের সকল আদেশ-নিষেধই কল্যাণকর। শুধু শর্ত হলো, সকল কাজই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, তাঁরই আদেশ-নিষেধের আওতাধীনে।

অতএব এখনই সময় ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত প্রকৃত মুসলিম, প্রতিভাবান, আগ্রহী, মেধাবী ও পরিশ্রমী তরুণদের সংগঠিত করে চলচ্চিত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা। উপমহাদেশের বাঙালী মুসলিমদের সৌভাগ্য আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পবিত্র কোরআনের তফসীর বিশ্ববিখ্যাত 'তাফহীমুল কোরআন', 'ফি জিলালিল কোরআন', সিয়াহ সাত্তাহ'র হাদীসগ্রন্থাবলী, মুসলমানদের শৌর্যবীর্যের ইতিহাস, অমুসলিম ইতিহাসবিদদের অনুবাদকৃত মুসলমানদেরকে নিয়ে মিথ্যা ও বিকৃত ইতিহাসের প্রমাণিত গ্রন্থ 'চেপে রাখা ইতিহাস', 'ইতিহাসের ইতিহাস', ছাড়াও ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির বিপুল সম্ভার এখন হাতের কাছে। ঈমান, ইসলাম, নামাজ-রোজা, যাকাত, হজ্জ্ব, জিহাদ, তৌহিদ, রিসালাত, অখেরাত, সমাজ-রাষ্ট্রগঠন, ইসলামী সংবিধান, বিচার-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, মোট কথা জীবন ও আধুনিক পৃথিবীর সর্ব বিষয়ে ইসলামের জ্ঞান, আদর্শ ও নীতি-বিধান সম্বলিত বই-পুস্তক পড়ে ইসলামের সঠিক রূপরেখা জানবার ও বুঝবার সুযোগ বর্তমান। তদুপরি ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক গ্রন্থ 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' চলচ্চিত্র আন্দোলনকারীদের নতুন পথের দিশা দিবে। যতই পৃথিবী আধুনিক হচ্ছে ততই প্রমাণিত হচ্ছে ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য সমস্ত মত ও পথ সংকীর্ণ, ভ্রান্ত এবং অমানবিক। ইসলামবিরোধী সমস্ত মত ও পথের অঙ্গজুড়ে আত্মস্বার্থ, নিষ্ঠুরতা, আত্মরম্ভিতা, অবৈধ স্বার্থগত পশুসুলভ প্রেম এবং অবৈধ যৌনাচার ভোগ। ইসলাম

www.bjilibrary.com

বিরোধী সমস্ত জ্ঞান, তত্ত্ব এবং অর্জন মিশে যায় ঐ কলঙ্কিত অকল্যাণকর, মনুষ্যত্বহীন শিকড়ে। যার থেকে উৎপন্ন জাহেলিয়াতের গাছের ছায়ায় শীতলতা নেই, আছে অস্থির অমানবিক স্বার্থগত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

এখন সময়ের তরঙ্গে নিত্য নতুনভাবে প্রমাণিত হচ্ছে একমাত্র ইসলামেই রয়েছে রাজ্যের বিশাল ব্যাপকতা এবং চিন্তার সঠিক ও সর্বোত্তম বিকাশের মাধ্যমই ইসলাম। অথচ যে চলচ্চিত্র মানুষের দৈনন্দিন আচরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি তুলে ধরে সেই বাস্তবতাকে মুসলমানেরা এতবছর ধরে অস্বীকার করে এসেছে। সেই সুযোগে প্রবল শক্তিমত্তা নিয়ে অগ্রগামী হয়েছে এমন সব চলচ্চিত্র যা ইসলামের আদর্শকে দুর্বল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক ভূমিকায় কাজ করে চলেছে। বর্তমানে ইরানী চলচ্চিত্র বিশ্বকে তাক লাগিয়ে ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত করার কাজে ব্রত।

যাই হোক, এখনই প্রয়োজন চলচ্চিত্র শিক্ষার। সময় অনেক পার হয়ে গেছে। তাই প্রয়োজন চলচ্চিত্র আন্দোলনের। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম তরুণরা যথার্থ সুষ্ঠু নিয়মের অধীনে চলচ্চিত্র-শিক্ষালাভ করতে পারলে একটা শক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। সে আন্দোলন শুধু বাংলাদেশে নয়, উপমহাদেশে এবং সমস্ত পৃথিবীতে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কল্যাণময় চিন্তার ব্যাপক বিকাশ ও প্রকাশ সম্ভব। জন্মলগ্ন থেকেই চলচ্চিত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। কিন্তু সেখানে মুসলিমরা অনুপস্থিত। কেন অনুপস্থিত তার নানান কারণ ছিল। এই প্রবন্ধের একপর্যায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। এবার উপমহাদেশে চলচ্চিত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে আলোকপাত করছি। প্রথাগত ধারার বিপরীতে অর্থাৎ বিপরীত স্রোতে চলতে গেলে অবশ্যই মেধা, শ্রম এবং ইচ্ছাশক্তিকে পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতে হবে। হতে হবে সাহসী। সঠিক পথে চলার জন্য সমষ্টিগতভাবে একটি আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। শিল্পের আলোচনায় বেরিয়ে আসবে আমাদের কি করণীয় এবং পথের রূপরেখা কি।

তথাকথিত সেক্স, ভায়োলেন্স এবং অশ্লীল ছবির বিরুদ্ধে নতুন ধারার ছবি নির্মাণ এবং প্রদর্শনের জন্য ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র সংসদ গঠিত হয় কলকাতায় ১৯৪৭ সালে। নাম ছিল, 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি'। প্রতিষ্ঠা করেন সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখ। আমাদের দেশে প্রথম চলচ্চিত্র সংসদ গড়ে ওঠে ১৯৬৩ সালে। সমাজ সচেতন কিছু তরুণ চলচ্চিত্র প্রেমীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই চলচ্চিত্র সংসদের নাম ছিল, 'পাকিস্তান ফিল্ম সোসাইটি'। স্বাধীনতার পর এর নাম হয় 'বাংলাদেশ ফিল্ম সোসাইটি'। চলচ্চিত্র আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত কিছু যোদ্ধা চলচ্চিত্র কর্মীকে দলবদ্ধ

www.bjilibrary.com

হওয়া এবং একটি গোষ্ঠি গঠন করা। যেটা সংসদ হিসেবে পরিচিত। এধরনের কিছু তরুণ ১৯৬৯ সালে আর একটি চলচ্চিত্র সংসদ গড়ে তোলে যার নাম 'ঢাকা সিনে ক্লাব'। এরপর বহু চলচ্চিত্র সংসদ গড়ে ওঠে বাংলাদেশে। এইসব চলচ্চিত্র সংসদ শিক্ষিত তরুণ শ্রেণীকে চলতি নিম্নরুচির চলচ্চিত্রের বিপরীতে বিকল্পধারার বক্তব্যধর্মী নান্দনিক চলচ্চিত্র দেখতে ও বুঝতে উৎসাহিত করে এবং সেই ধরনের মানসিকতা গঠনে ভূমিকা রাখে। এটা মূলত একরকম দাওয়াতী কার্যক্রম। সংসদগুলোর কার্যক্রম ছিল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বক্তব্যধর্মী ক্লাসিক চলচ্চিত্রগুলো সংগ্রহ করা, সেইসব চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমাজ সচেতন দর্শক গড়ে তোলা এবং সদস্যদেরকে চলচ্চিত্র নির্মাণ, চিত্রনাট্য লিখন পদ্ধতি এবং সংলাপ রচনা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলা। চলচ্চিত্রবিষয়ক প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় সমৃদ্ধ ম্যাগাজিন প্রকাশ করা ঢাকার বাইরে বিভিন্ন মফঃস্বল শহরেও তারা তাদের শাখা সংগঠন তৈরি করে এবং মফঃস্বলের তরুণদেরকে তাদের ভাষায় সুস্থ চলচ্চিত্রের প্রতি উৎসাহিত করে তোলে। সেই প্রক্রিয়া আজো অব্যাহত। [প্রবন্ধ লেখক ছাত্রজীবনে এই ধরনের একটি সংসদের শিক্ষার্থী হয়ে সুস্থ চলচ্চিত্র বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন, যদিও বাস্তবের নির্মমতায় প্রচলিত ও প্রথাগত চলচ্চিত্রের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন।]

চলচ্চিত্র সংসদ প্রতিষ্ঠা করে আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ সচেতন চলচ্চিত্রকর্মীরা যে অগ্রগতি সাধন করেছে তার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে তারাই স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি নির্মাণ এবং পরবর্তীতে পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি, প্রচারধর্মী, বিজ্ঞাপন-চিত্র, তথ্যচিত্র নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেরও আয়োজন করেছে এবং করছে। চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীদের দাবির মুখে বাংলাদেশ সরকার 'ফিল্ম আর্কাইভ' গঠন করে। তাদেরই অনুরোধে পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সতীশ বাহাদুর এই প্রতিষ্ঠানের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন। সেখানে অনিয়মিত হলেও ফিল্ম বিষয়ে প্রশিক্ষণের কাজও হয়েছে।

এসবের বিপরীতে বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাদের অনুসারী তরুণদের সমাজ সচেতনতার পাশাপাশি চলচ্চিত্র বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত না করে বা কোনো সুযোগ সৃষ্টি না করে তাদেরকে প্রতিক্রিয়া দেখানোতে পারদর্শী করে তুলেছেন। এতে সেইসব তরুণদের সৃজনশীলতার উৎসমুখ যেমন মরে গেছে তেমনি তারা পরিশ্রম বিমুখ হয়ে পড়েছে। প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য যেখানে অনুচ্চ কণ্ঠে একটু প্রতিবাদই যথেষ্ট সেখানে সৃজনশীলতার দাবি মিটাতে কঠিন পরিশ্রম কে করতে চায়! ১৯৬৮ সালে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট সত্যেন সেন প্রতিষ্ঠা করেন 'উদীচী শিল্পী গোষ্ঠি'। সেই সময়ের বিভিন্ন শিল্পী, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি ও চলচ্চিত্র সংসদ কমিউনিজমের ভাবধারায় পরিচালিত হয়। বেশির ভাগই ছিল সক্রিয় কমিউনিস্ট নতুবা কমিউনিস্ট মতবাদে তাড়িত।

www.bjilibrary.com

'উদীচী' ছিল তাদের সকল কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা। পরবর্তীতে এদের কেউ কেউ বিদেশের ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে ফিল্ম বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে। বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন চিত্র, টিভি, রেডিও, পত্র-পত্রিকার সাহিত্য-সংস্কৃতির পাতা এবং বিকল্পধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রকে এরা দখল করে রাখে। আজো অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত কমিউনিজম ভাবধারার ব্যক্তিবর্গ তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তারা নামে মুসলিম হলেও ইসলাম তাদের কাছে অজানা। বরং মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, ডারউইন তারা যেভাবে আত্মস্থ করেছে, চর্চা করেছে এবং মন-মস্তিষ্কে গেঁথে নিয়েছে সেভাবে তারা কখনো কোরআন পড়েনি, রাসূল (সা.)-এর কর্মজীবন পড়েনি বা পড়তে চেষ্টাও করেনি। কমিউনিজম এবং ডারউইনবাদ প্রত্যাখ্যাত হলেও বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা এখনো সেই ব্যর্থ মতবাদে অটল। কারণ এই হতে পারে যে, মানুষের সৃজনশীলতা অদম্য, অটল। তা যখন বন্যার পানির মত বাঁধ ভেঙ্গে প্রবাহিত হয় তখন পিছন দিকে তার আর দেখা হয় না, যতক্ষণ না সে সব কিছু ডুবিয়ে ছাড়ে।

মুসলিম নেতৃবর্গ প্রতিভাধর মেধাবী সৃজনশীলদের কোন পথ করে দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ইসলামী নাটক, চলচ্চিত্র বা সামগ্রিক অর্থে সংস্কৃতির বিকাশ সাধিত হয়নি। ইজতিহাদ বা কিয়াসের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন পাঠ শিখানো বা ইমামতি করাটাকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজকে পেশা হিসেবে নেয়াটার বিষয়ে কোন উৎসাহী নির্দেশনা পাওয়া যায়নি বরং পেশাগতভাবে গ্রহণে হতাশ করা হয়।

এদিকে বামধারার সাংস্কৃতিক কর্মীরা যখন নাটক বা চলচ্চিত্র তৈরি করছে তখন তারা তাদের চলচ্চিত্রে কোথাও কোথাও ইসলামকে এমনভাবে পেশ করছে যা আদৌ ইসলাম নয় বা কোথাও কোথাও জেনে বুঝে হেয় করছে এবং অপমান করছে। তাদের নাটক চলচ্চিত্রে মার্কসীয় ভাবধারা ও আদর্শ প্রকট যা সহজ-সরল মুসলিম তরুণদেরকে মানসিক বিভ্রান্তিতে সহসা লিপ্ত করতে পারে। ওদের মানসিক চিন্তাগত ভিত তৈরি হয়েছে অনৈসলামিকতার উপর। পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জাহেলিয়াতের রসে সিক্ত এবং জাহেলিয়াতের স্পর্শে পালিত ও লালিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই তাদের নির্মিত বিভিন্ন চলচ্চিত্রে তাদের আদর্শের প্রকাশ নির্ভেজাল জাহেলিয়াত এবং কোথাও কোথাও বা মুশরিকি ভাবধারায় উজ্জীবিত।

যেহেতু আমাদের দেশে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র শিক্ষা দেয়া হয় না, তাই যারা হাতে-কলমে চলচ্চিত্র শিখতে চান তারা চলচ্চিত্রের মূলধারা হোক অথবা বিকল্পধারা হোক তাকে পরিচালকের অধীনে থেকে চলচ্চিত্র শিখতে হয়। সরকারী এবং ব্যক্তি উদ্যোগে অল্প দু'একটা চলচ্চিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে

www.bjilibrary.com

চলছে]। যাদের মানসিক ভিত্তি, নৈতিক ভিত্তি এবং যাদের কর্মজগতটাই সম্পূর্ণ নির্ভেজাল জাহেলিয়াত তাদের সঙ্গে শিক্ষানবিশি করার কোন প্রকার পরিবেশ পাবে না সম্পূর্ণ ইসলামী আদর্শের ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান একজন তরুণ মুসলিম। বরং হয় সে পথভ্রষ্ট হবে নতুবা বিরক্ত হয়ে প্রত্যাখ্যান করে চলে আসবে এবং আর শিখতে চাইবে না। পূর্বে যেসব চলচ্চিত্র আন্দোলনের কথা আমি উল্লেখ করেছি, তাতে চলচ্চিত্র শিক্ষার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উপায় ছিল না। যদিও বর্তমানে বিভিন্ন দেশের স্কুল-কলেজে চলচ্চিত্রকে পাঠ্যক্রম করা হয়েছে। ফ্রান্সে চল্লিশের দশকে চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রচলন হয়। ১৯৫০-এ দু'বছরের পাঠ্যক্রম চালু হয়। ইংল্যান্ডে ১৯৬০ সালে ৭০০ স্কুলে ফিল্ম ও টেলিভিশন শিক্ষা দেয়া হয়। সেখানে চলচ্চিত্র শিক্ষকদের সমিতিও আছে।

আমেরিকায় ক্লাস প্রোজেক্ট হিসেবে ক্লাস সেভেনেই সিনেমা তৈরি করার কাজ শুরু হয়। বর্তমানে আমেরিকায় প্রায় ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ইংল্যান্ডে অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১০০। সংস্কৃতির সকল দিকই সন্নিবেশিত হয় ফিল্মে আর ফিল্ম তাই ব্যাপক শক্তিশালী মাধ্যম। ফিল্ম সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে, বলিয়ান করে এবং সর্বোতভাবে সমর্থন জোগায়।

যেহেতু ফিল্ম একটি মাধ্যম- গণমাধ্যম, তাই গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে তরুণদের সম্যক ধারণা না থাকলে ফিল্মের বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করা তরুণদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্য যে সমাজে তরুণরা বাস করে তার কাঠামো, তার প্রকৃতি, তার চরিত্র সম্পর্কে তরুণদের সন্ধানী প্রশ্ন উত্থাপন করা দরকার। তার উত্তর পাওয়া ও জরুরি। অতএব দেখা যাচ্ছে, কোনো কার্যকরী চলচ্চিত্র শিক্ষা প্রকল্প এবং তাতে সক্রিয় হওয়ার অর্থ হলো তরুণদের সামাজিক জীবনে দায়িত্বশীল প্রবেশের একটা মহান উদ্যোগের অংশবিশেষ।

যাদের মানসিক ভিত্তি ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কোরআন, হাদীস, ফিকাহ্ শাস্ত্র এবং অন্যান্য ইসলামী সাহিত্যচর্চায় যারা নিবিষ্ট তারাই কেবল চলচ্চিত্র শিক্ষার উপযুক্ত। তাদেরকে প্রথমেই এই সবক নিয়ে আত্মস্থ করা দরকার যে, পৃথিবীর সব মানবিক কল্যাণকে অবজ্ঞা করে শুধু নিজেদেরকে পূজনীয় করে তুলবার জন্য কোন লেখক, কবি, পরিচালক, শিল্পী চলচ্চিত্র শিক্ষা করবে না। নিজেদেরকে পূজা পাবার উপযোগী করে তুলবার জন্য সার্বজনীন মানবিক কল্যাণকে তারা ছুঁড়ে ফেলবে না। ইসলাম যে মানবকল্যাণের দিশা দিয়েছে সেই নীতি ও নৈতিকতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে দায়িত্বশীল ও যত্নবান হতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিপূজা নয়, আদর্শ প্রতিষ্ঠাই হবে একজন চলচ্চিত্র শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীর মূল বিষয়। নিজেকে প্রিয় হিসেবে নয় বরং সত্য

www.bjilibrary.com

হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চলচ্চিত্র শিক্ষার দুটি ধরন আছে। ১. চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষা। ২. চলচ্চিত্রের কাছ থেকে শিক্ষা।

এই দুই ধরনের ব্যবস্থা করাই একটি চলচ্চিত্র সংগঠনের প্রাথমিক কাজ। একটি কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র শিবিরের অধীনে ছোট ছোট শিবির করে ইসলামী আদর্শের এবং ইসলামী আদর্শের নয় আবার ইসলামী নীতির বিরোধীও নয়, এমন সব ছবি প্রদর্শনী করে তা অনুশীলন করতে পারে। সাহিত্যের পাঠ যেমন ধ্রুপদী সাহিত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তেমনি চলচ্চিত্রের পাঠক্রম মূলত ক্লাসিক ছবিগুলোকে কেন্দ্র করে। তাই এই ধরনের ক্লাসিক ছবি সংগ্রহ করে তা দেখা, শোনা, ভাবনা ও অনুভবের এক বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এবং পোর্টেবল প্রজেক্টরের মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারে। এতে চলচ্চিত্রের শিক্ষার দুটি প্রাথমিক দিকই কার্যকরী করার সূচনা হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলচ্চিত্র শিক্ষার এই পদ্ধতিই স্বীকৃত।

চলচ্চিত্র সমাজের স্বীকৃত ভাবনা ও মনোভাবকে প্রাধান্য দিয়েই তাকে বেগবান করে নতুবা বাধার সৃষ্টি করে কিন্তু সে দ্রুত কিছু পাল্টে দেবার ক্ষমতা রাখে না বরং যা গ্রহণযোগ্য ছিল না চলচ্চিত্র ধীরে ধীরে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষমতা রাখে। যেমন আমাদের মুসলিম সমাজে বহুকিছু গ্রহণযোগ্য ছিল না, যথা মেয়েদের হাতাকাটা ব্লাউজ, ওড়নাবিহীন মহিলা অথবা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম খাওয়া, যুবক-যুবতীর প্রেমলীলা এরকম বহুকিছু। চলচ্চিত্র এইসব বিষয়কে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। আবার এমন অনেক বিষয় আছে যা নিতান্তই ইসলামের মৌলিক বিষয় সেগুলোকে প্রচলনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে। যেমন হাদীসের বাণীকে বাধাগ্রস্ত করে মনীষীদের বাণীর প্রচলন। নামাজ, রোজা ছাড়াও ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে চেপে বা ঢেকে রেখে (যাকে কুফর বলা হয়) মানব রচিত বিধানের জয়গান গাওয়া ইত্যাদি। অথচ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ইসলামের বিধি-বিধানের সর্বজনীন মানবীয় কল্যাণকে নিজেদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল। তা না করে বরং মুসলিম চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম বিষয়গুলিকে বিকৃত করে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যা আজ ইরান চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করছে।

তথাকথিত আধুনিকতা এবং আমেরিকা ইউরোপীয় সংস্কৃতি একটা নিরেট জাহেলী মন-মস্তিষ্ক তৈরি করতে সচেষ্ট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সফলও। ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবন-ব্যবস্থার আলোকে চিরন্তন মানবীয় অথবা চির আধুনিক ইসলামী মূল্যবোধকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ওইসব জাহেলী মন-মস্তিষ্কের অধিকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব। যেমন সম্ভব

www.bjilibrary.com

হয়েছিল অতীতের মুসলিম শাসনের সময়। অল্পবয়সীরা চলচ্চিত্র, টিভি, নাটক এবং বিজ্ঞাপনচিত্রের অভিনয় শিল্পীদের ও সংগীত শিল্পীদেরকে যে সব কারণে অনুকরণ করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুসরণের মানসিকতা গঠন করে, সে কারণগুলির অনুসন্ধান না করেও নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, সে সমস্ত অল্পবয়সীরা যেমন বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হচ্ছে তেমনি ওইসব অভিনয় ও সংগীত শিল্পীরা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ তথা নিজস্ব ব্যক্তি ইমেজ তৈরি করার ক্ষেত্রে অল্পবয়সীদের চিন্তা জগতে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে এমন কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না। প্রকৃত অর্থে তারা ইসলাম তথা শান্তিবিরোধী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সেই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার এবং অর্থ-সম্পদ অর্জনের কাজে লিপ্ত। আর তাই তারা শান্তিকামী সমাজ ও মানবকল্যাণের জন্য উপকারী নয়। ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারকারী কখনো সার্বজনীন মানবকল্যাণের জন্য উপকারী হতে পারে না। তাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজে বিশেষ করে অল্পবয়সীদের মধ্যে জাহেলিয়াতের শিকড় বিস্তার হচ্ছে এবং সেটা ব্যাপক হচ্ছে দ্রুতগতিতে। তাদের কর্মপন্থার বিপরীতে যৌক্তিক এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে শুধুমাত্র মৌখিক বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে তারা তাদের বিরোধীতাকারীদেরকে অসামাজিক, অসংস্কৃত, অনাধুনিক, প্রগতির অন্তরায়, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ইত্যাদি বলে প্রকটভাবে শত্রুতা করে মুসলিম সমাজকে বহুধাবিভক্ত করে ফেলেছে।

অতএব ইসলামী দৃষ্টিতে চলচ্চিত্র শিক্ষার্থী এবং আন্দোলনকারীদের সদা-সর্বদা সতর্কতার সঙ্গে ব্যক্তি স্বার্থ না দেখে মানবতার স্বার্থকে ইসলামী আদর্শের পথে নির্ণয় করতে হবে এবং প্রাধান্য দিতে হবে।

চলচ্চিত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথমে যা দরকার তা হলো উন্নতমানের ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট ছবিকে সহজলভ্য করা। যেমন দি ম্যাসেজ, ওমর মুখতার, বা ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদি ছবি, অথবা ইসলামী ভাবধারার নয় কিন্তু ইসলামবিরোধীও নয় এমন সব ছবি, যেমন অক্টোবর, ব্যাটেলশীপ পোটেমকিন, পথের পাঁচালী, হীরক রাজার দেশে, একদিন প্রতিদিন, বাইসাইকেল থিভ, চিলড্রেন হ্যাভেন বা ফাদার ইত্যাদি। এই সমস্ত ছবির প্রদর্শনী ও অনুশীলন দরকার।

প্রতিটি চলচ্চিত্র শিবিরকে এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। এবং নির্মিত ছবিগুলির মান উন্নয়নে চলচ্চিত্র শিবিরের ভূমিকা থাকবে নেতৃস্থানীয়। কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র শিবির চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকা, প্রচারপত্র, পুস্তিকা, ম্যাগাজিন প্রকাশ করে জনসাধারণের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। তারা বাৎসরিক ইসলামী চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করতে পারে, পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থাও করতে পারে। উন্নত ভিডিও ছবি তৈরির আনুষঙ্গিক টেকনোলজির ব্যবস্থা করতে পারে যাতে কম খরচে চলচ্চিত্র উৎপাদন ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

www.bjilibrary.com

ভিডিও ক্যামেরা, প্রজেক্টর মেশিন, পর্দা, লাইট, ট্রলি, ক্রেন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এইভাবে একটা চলচ্চিত্র শিক্ষা এবং চলচ্চিত্র আন্দোলন সংগঠিত করা সম্ভব। চলচ্চিত্র একটা বিরাট ও ব্যাপক গণমাধ্যম, সেহেতু রেডিও, পত্রিকা, বিজ্ঞাপন ও টিভি'র মতো চলচ্চিত্র ও শিক্ষার একটা মাধ্যম। এগুলি সবই প্রযুক্তি নির্ভর। একদিকে নির্মাতা অন্যদিকে দর্শক, মাধ্যম হলো চলচ্চিত্র। অতএব মাধ্যম শিক্ষার যাবতীয় উপাদান ও উপকরণ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত। চলচ্চিত্র সব সময় সমাজের ভাষায় কথা বলে। কারণ এটি একটি মাধ্যম। উন্নত দেশে মাধ্যম বিষয়ে নতুন নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। সেখানে মাধ্যম বিষয়ের শিক্ষা প্রাধান্য পায়। বর্তমান পৃথিবীতে 'মাধ্যমের' মাধ্যমে জনগণ তার মানসিক চাহিদা এবং প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। আমেরিকায় মাধ্যমকে রূপ দেয় ভোগপণ্যবাদ। অর্থ ও সংযোগের মধ্যে এই মিলন সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে নিষ্পন্ন হয় ক্লাস ঘরের মাধ্যম যন্ত্রের ব্যবহার থেকে বহুজাতিক সংস্থাগুলির সংযোগ উপগ্রহের সাহায্য গ্রহণ [টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনধর্মী শিক্ষানুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার] পর্যন্ত।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্রকে বিভিন্ন রূপে দেখা হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্র একটি পণ্যদ্রব্য, একটা ভোগ্যবস্তু, যা কোনো দেশের এক অন্যতম বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রির দ্বারা উৎপাদিত।

দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্র হলো আবেগময় অভিজ্ঞতা। একজন নির্মাতার দৃষ্টিতে চলচ্চিত্র একটি সৃষ্টি যা মানুষের চেতনাকে নাড়া দেয়। এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্রকে বিভিন্নভাবে দেখা যেতে পারে। তবে চলচ্চিত্র সব সময় শিল্প নয়, কিন্তু সব সময় তা একটি পণ্যদ্রব্য, একটা অভিজ্ঞতা, একটা পরিবেশ, এটাও মনে রাখতে হবে। তরুণ জীবনে চলচ্চিত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাদের মন-মস্তিষ্ক, চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা, নৈতিকতাকে চলচ্চিত্র হয় সমর্থন করে, শক্তিশালী করে এবং বেগবান করে নতুবা বাধাগ্রস্ত করে। তাই চলচ্চিত্রকে সেই সব বিষয়বস্তুর আঙ্গিকে শিক্ষালাভ করতে হবে যা ইসলাম সমর্থন করে। কারণ প্রমাণিত সত্য হিসেবে ইসলামই নৈতিকতার এবং জ্ঞান বিকাশের একমাত্র মানদণ্ড।

চলচ্চিত্রকে অবজ্ঞা করা এবং উপেক্ষা করা মানে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। পৃথিবীর বৃহত্তর আদর্শিক জনগোষ্ঠি হিসেবে মুসলমানদেরকে তাদেরই আদর্শিক পথে চলচ্চিত্রকে গতিশীল করা একান্ত প্রয়োজন। যাতে তাদের কল্যাণকামী চিন্তা-চিন্তন, সমাজ ও পৃথিবীর পথে তাদের মিশনের স্বরূপ এবং সর্বোপরি তাদের আলোকময় অস্তিত্ব সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ অবহিত হতে পারে।

www.bjilibrary.com

চলচ্চিত্র তথা মিডিয়ার জন্য লেখালেখি

আমরা গণমাধ্যম বা মিডিয়াগুলোতে যা দেখি, শুনি বা পড়ি তা সবই একটি জাতির সংস্কৃতির প্রকাশ্য রূপ। গণমাধ্যম বলতে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, কম্পিউটার, রেডিও, মঞ্চ, পত্র-পত্রিকা, ভিসিডি, ক্যাসেট, বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন সবই বুঝায়। আর এসবের মাধ্যমে যে সংস্কৃতির যোগান দেয়া হয় তার উপস্থাপনা একজন লেখকের চিন্তাপ্রসূত এবং বেশিরভাগই গল্পকেন্দ্রিক। অনেক বিদেশি টিভি চ্যানেল খবর পড়ার মধ্যেই একটা বিশেষ খবরকে বিশ্বাসযোগ্য, রসময় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য গল্প দেখানোর মতো করে দেখায়। বাস্তব জীবনেও আমরা গল্প শুনতে ও বলতে ভালোবাসি।

অফিস থেকে ফিরে কেউ অফিসের গল্প বলে, দেশের বাড়ি থেকে ফিরে এসে প্রায় লোকই দেশের গল্প বলে। ছাত্ররা ছুটিতে বাড়ি গিয়ে কলেজ-ভার্সিটি এবং হোস্টেল বা মেসের গল্প বলে। দেশের বাড়ির কোনো আত্মীয় হলে মানুষ তার কাছে দেশের নানান গল্প শুনতে চায়। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর বা সংসদ ভবনে কেউ গেলে বাড়ির লোক বা বন্ধুরা সেখানকার গল্প শোনার বায়না ধরে। ছোটবেলায় বাবা-মা, দাদা-দাদী বা নানা-নানীর কাছে গল্প শুনতে চায়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বিদেশ থেকে কেউ এলে তার কাছে বিদেশের গল্প শোনার জন্য তো রীতিমতো ভিড় লেগে যায়। মোটকথা, মানুষ সদা-সর্বদা কোনো না কোনোভাবে গল্প বলছে এবং শুনছে।

রসিয়ে রসিয়ে একটা সামান্য ঘটনাও কেউ কেউ এমনভাবে বলতে পারে যে, শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শোনে। আর রসিয়ে গল্প বলার জন্য ব্যক্তির একটা বিশেষ জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় পরিচিত মহলে। গল্পের মাধ্যমে যেসব ঘটনা এবং বিষয়বস্তুর প্রকাশ ঘটে তা থেকে আনন্দের সঙ্গে মানুষ শিক্ষা, বৈধ-অবৈধ কর্মকাণ্ডের স্বরূপ এবং লাভ-ক্ষতির দিকগুলো ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

www.bjilibrary.com

আর এই গল্প চলচ্চিত্র তথা মিডিয়ার মূল উপাদান। সাহিত্য, কাব্য, সংগীতের মূল উপাদানও গল্প। কোথাও তা মূর্ত কোথাও তা বিমূর্ত, কোথাও বাও তা মুখ্য কোথাও তা গৌণ, কোথাও তা প্রত্যক্ষ কোথাও তা পরোক্ষ। টিভি, রেডিও, পত্র-পত্রিকায় যেসব সাক্ষাৎকার, আলোচনা, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমরা দেখি সেসব অনুষ্ঠানের নেপথ্যে একজন লেখক সত্তার চিন্তা-ভাবনা সক্রিয় থাকে।

বিংশ শতাব্দির সূচনাতেই চলচ্চিত্রের আগমন। এরপর পর্যায়ক্রমে টিভি, রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার, ভিডিও কম্পিউটার, ইনটারনেট, মোবাইল ফোন এসেছে। আর এসব মাধ্যম আজ সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম অনুষঙ্গ। এসব মাধ্যমে মানুষ তার মনের চাহিদার প্রতিফলন দেখতে আগ্রহী। আজকের যুগে প্রায় প্রতিটি মানুষই গল্প খবর, ইতিহাস, জীবনাচরণ, বক্তব্য, দেশ-বিদেশের প্রকৃতি ইত্যাদি পড়ার চেয়ে বা শোনার চেয়ে দেখার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে। এজন্য প্রকাশনার মাধ্যমটির সাথে যারা ব্যবসায়িকভাবে জড়িত, তারা তাদের ব্যবসা নিয়ে চিন্তিত। আর প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে যারা লেখক হিসেবে জড়িত তারা বেশিরভাগই দর্শনযোগ্য অর্থাৎ মিডিয়ার লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে আগ্রহী। এখনতো দশ সেকেন্ডের একটা বিজ্ঞাপনচিত্রও গল্পভিত্তিক হয়ে গেছে। হয়তো সামনে এমন দিন আসবে যে, বক্তারা কষ্ট করে আর জনসভায় না গিয়ে তাদের বক্তব্য কম্পিউটার ও ভিসিডির মাধ্যমে বাজারজাত- করবেন। আর তার পেছনেও থাকবে একজন লেখকের সক্রিয় ভূমিকা।

তাই এই মুহূর্তে চলচ্চিত্র, টিভি, ভিসিডি, ক্যাসেট, মঞ্চ ইত্যাদির লেখালেখির কর্মটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেখার কাজটি গদ্যসাহিত্য, কাব্য বা সংগীতের মাধ্যমে তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ প্রথমে লেখার কাজ, তারপর চিত্রনাট্য, তারপর চলচ্চিত্র- এই হলো চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত ও সামগ্রিক রূপরেখা। আর ক্যামেরা হলো চলচ্চিত্রের বাহন।

লেখার পরের কাজগুলি সবই টেকনিক্যাল, আমি শুধুমাত্র লেখালেখি করার জন্য যে প্রস্তুতি, এই প্রবন্ধে সেই বিষয়েই আলোচনা করছি বিধায় তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করবো। আমরা সিনেমা, টিভি এবং কম্পিউটারের পর্দায় যা কিছুই দেখি তা সবই চলচ্চিত্র। বিষয়বস্তু, বক্তব্য, সময়সীমা, উপস্থাপনা ও সামগ্রিক আঙ্গিকের বিচারে এসবের শ্রেণীভাগ করা হয়েছে। যেমন পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, বিজ্ঞাপন চিত্র, সংবাদচিত্র, টেলিফিল্ম, ছড়া প্যাকেজ নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি। আবার সংস্কৃতি সংক্রান্ত এসব মাধ্যমগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে:

www.bjilibrary.com

১. শব্দজনিত : ভাষা [সংলাপ], নৃত্য, সংগীত, নাট্যকলা ইত্যাদি।

২. টেকনিক্যাল বই পুস্তক মুদ্রণ, সংবাদপত্র, রেডিও, ভিসিডি ক্যাসেট [কারিগরি মাধ্যম] ইত্যাদি।

৩. ছবি ও শব্দ তরঙ্গজনিত বৈজ্ঞানিক মাধ্যমঃ কম্পিউটার, টিভি ও চলচ্চিত্র। এই মাধ্যমগুলির প্রাণকেন্দ্র হলো চলচ্চিত্র একমাত্র চলচ্চিত্রের গর্ভেই উক্ত সকল মাধ্যমগুলোর আবাসস্থল। অতএব, একমাত্র চলচ্চিত্রের জন্য লেখার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারলে বাকি বিষয়গুলোর জন্য লেখা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, চলচ্চিত্রের লেখালেখির কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম বা পদ্ধতি নেই। শুধুমাত্র নিম্নের গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে পারলে চলচ্চিত্রের জন্য লেখালেখি করা সম্ভব। এই চারটিই একজন লেখকের জন্য মৌলিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য।

১. সাহিত্যবোধ

প্রচুর লেখাপড়া করতে হবে। ভালো সাহিত্য ভালো সাহিত্যবোধ তৈরি করে। অন্যান্য শিক্ষার জন্য ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ কাহিনী, জীবন কাহিনী, রাজনীতি বিষয়ক পুস্তকাদি পড়া উচিত। বিশ্বের বিভিন্ন জনপদ, তাদের জীবনাচরণ, পেশা এবং মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করতে হবে। আর এসব জ্ঞান থেকে সুস্থ রুচিবোধ আয়ত্ত করা কর্তব্য।

২. চলচ্চিত্রবোধ

ভালো ভালো ছবি দেখতে হবে। সাধারণ দর্শকের আবেগী দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা নিয়ে ছবিগুলোর পরিবেশ, প্রকৃতি, চরিত্র, সংলাপ, চরিত্রের আচার-আচরণ ও নৈতিকবোধ দেখতে হবে। চলচ্চিত্র বিষয়ে রচনা পড়তে হবে।

৩. বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি

নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। একজন যুক্তিবাদী প্রবন্ধকারের দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে হবে।

৪. মনস্তত্ত্ব

মানুষের অভিব্যক্তি, বিশেষ করে মানুষের দৃষ্টিপাতের অর্থ, মুখ ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির অভিব্যক্তি দেখে তার মানসিক অবস্থা নির্ণয় ও পছন্দ-অপছন্দ অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। একজন লেখকের জন্য মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন ও চর্চা করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

www.bjilibrary.com

উক্ত চারটি মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে চর্চা করা এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারলেই যে ভালো লেখক হওয়া যাবে তা নয়। তবে লেখক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে চাইলে উক্ত বিষয়গুলো আয়ত্তে থাকা চাই। এরপর অনুশীলন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়েই ক্রমে ক্রমে চলচ্চিত্রের লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

উক্ত চারটি বিষয় একজন লেখককে লেখালেখি করার প্রধান প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্যের দিকে ধাবিত করেঃ ১. পরিবেশ সৃষ্টি ২. চরিত্র সৃষ্টি ৩. অপ্রধান ঘটনার সঙ্গে প্রধান ঘটনার সংযোগ স্থাপন এবং ৪. খণ্ড খণ্ড পরস্পর বিযুক্ত বিষয়কে প্রধানত পরস্পরের সাহায্যে একটি অর্থসূত্রে গেঁথে তোলা।

চিত্রনাট্য রচনা ও সম্পাদনার কাজেও উক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য সমভাবে প্রযোজ্য। এখন প্রশ্ন হলো, ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী কি উক্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে পারলে লেখক হিসেবে তার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে? এর জবাব এক কথায় 'না'। তাকে আরো কিছু অর্জন করতে হবে। কারণ একটা বিশেষ কিছু করতে গেলে বিশেষ কিছু জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-ভাবনা, মূল্যমান এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে। বিশেষ কিছু আকিদা বিশ্বাসকে ধারণ করতে হবে, তাকে ভিত্তি করতে হবে। ইসলাম একটি বিশেষ জীবনব্যবস্থা, একটি বিশেষ আদর্শ। এই বিশেষ আদর্শকে ভিত্তি করে যখন কেউ কোনো কর্মকাণ্ড রপ্ত করতে চাইবে তখন অবশ্যই তাকে উক্ত আদর্শ প্রসঙ্গে ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে হবে। কর্মের স্বরূপ হিসেবে ইসলামের নানামুখি শিক্ষা বিদ্যমান। যেহেতু কর্মটি গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমের জন্য লেখালেখি সেহেতু নিজেকে লেখক হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

সূর্যের আলো ও রাতের কৃত্রিম আলোর মধ্যে বিস্তর তফাৎ। শুধুমাত্র ইসলামকে জেনে বুঝে গণমাধ্যমের জন্য কিছু রচনা করা, রাতের কৃত্রিম আলোর মতো। তা দিয়ে ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। কিন্তু ইসলামকে জেনে বুঝে, আত্মস্থ করে ব্যক্তিজীবনে আমল করে, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি বিবেক-বিবেচনা দিয়ে আত্মাকে প্রসারিত ও ব্যাপক এবং পবিত্র করতে পারলে তার দৃষ্টিভঙ্গির চিন্তা-ভাবনা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে সার্বজনীন, মানবীয় এবং সমগ্র মানবকল্যাণে সমৃদ্ধ। তখন তার আলো হবে সূর্যের আলোর মতো। শত্রু মিত্র সবার জন্যে তার প্রেমময় দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটবে। তখন লেখকের কলম যা লিখবে তা ইসলামী হবে বলেই বিশ্বাস করি। কারণ ইসলামকে জেনে বুঝে আত্মস্থ করা ও ব্যক্তিজীবনে আমল করার অর্থই হলো কুরআন ও সুন্নাহর চিরন্তন আলোক রাজ্যে অবগাহন করা। তার থেকে আলোই ঠিকরে বেরুবে, তা অন্ধকার বিলাবে না। যেমন বরফের কাছে আমরা ঠাণ্ডারই আশা করি। বরফের কাছে কেউ তাপ আশা করে না।

www.bjilibrary.com

একমাত্র ইসলামেই রয়েছে ব্যাপক বিস্তৃত চিন্তার রাজ্য, আর সেই চিন্তার আলোকে অজস্র কিসিমের রচনা লেখা সম্ভব। বর্তমানে একটা ইসলামী টিভি চ্যানেল চালাবার মতো কেনো অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়তো আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে যে বিপুল প্রতিভাদীপ্ত তরুণদের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তারা যদি লেখালেখির জন্য প্রাথমিকভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করেন তবে তাদের দ্বারা বিপুল সংখ্যক চলচ্চিত্রই শুধু নয়, এমন সব বিভিন্নমুখী অনুষ্ঠান নির্মাণ সম্ভব যা দিয়ে একটা মাত্র ইসলামী টিভি চ্যানেল নয়, চার পাঁচটা টিভি চ্যানেল দিবারাত্র চালানো সম্ভব। ইসলামে এতো বিপুল, ব্যাপক ও বিশাল চিন্তার অবকাশ রয়েছে, আরো রয়েছে আগ্রহী প্রতিভাধর মেধাবী সব শিল্পী ও লেখক।

ইসলামী শিক্ষা আত্মস্থ করার পর, একজন লেখক যদি কোনো সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের প্রশ্নমালা তৈরি করেন তবে প্রশ্নের স্টাইল এবং অর্থই হবে অন্য ধরনের। প্রশ্নগুলো জাহিলীর পরিবর্তে হয়ে উঠবে মানবিক, সার্বজনীন এবং পূর্ণাঙ্গ ঐতিহ্যমাখা, যা সাধারণ দর্শকদের অন্তর্লোকে কারো প্রতি বিদ্বেষের বীজ বপন করবে না, বরং একটা পজেটিভ চিন্তাধারার চর্চা হবে। এমনিভাবে কোনো আলোচনা অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, বিজ্ঞাপনচিত্রের ভাষা এমনকি খবর পাঠের ভাষা, রঙ, রূপও বদলে যাবে। জাহেলিয়াত ও ইসলামের পার্থক্য শুধু সামান্য কতোগুলো মোটা দাগের চিন্তা ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ পার্থক্য শোয়া, ঘুমানো, উঠাবসা, পানি খাওয়া থেকে শুরু করে আলাপচারিতা, সম্বোধন, ভাষা ও শব্দবিন্যাসে এবং শেষমেষ যুদ্ধ, সন্ধি সবকিছুতেই সেই পার্থক্যই ফুটে উঠবে একজন লেখকের কলমের ডগায়। কিন্তু ইসলামকে সঠিকভাবে না জেনে না বুঝে না গ্রহণ করে যদি কেউ কিছু লেখেন তবে তার লেখা দেখে মনে হবে তিনি মডেল হিসেবে জাহেলিয়াতকে সামনে রাখছেন, জাহেলিয়াতকে তিনি মানদণ্ড হিসেবে স্থির করেছেন। তাই তার লেখাগুলো জাহেলিয়াতের ট্রাজেডি, কমেডি ও রোমান্টিকতায় পূর্ণ হতে পারে।

না– ইসলাম তা নয়। আর তা যে নয় তা বুঝতে গেলে প্রথমে যা দরকার তা হলো মন-মস্তিষ্ক থেকে সমস্ত জাহেলী দৃশ্যপট ও চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে হবে। পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত পরিবেশের সমস্ত লোকজন ও বন্ধু-বান্ধব সম্পূর্ণ ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও ইসলামী চেতনায় উদ্দীপ্ত হতে হবে। তা না হলে তা সযত্নে বর্জন করতে হবে। চোখের মধ্যে গুঁজে কিছু দেখা যায় না। বস্তুকে একটু দূরে রাখলেই তা দেখা যায়। তদ্রূপ জাহেলিয়াতের বায়ুমণ্ডলে ডুবে থেকে জাহেলিয়াতকে চেনা সম্ভব নয়। ঈমানের সমুদ্রে ডুবে থেকে দূর থেকে জাহেলিয়াতকে দেখতে হবে। জাহেলী সংস্কৃতি যে কোনো মডেল বা

www.bjilibrary.com

মানদণ্ড নয়, ইসলাম যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির আধার এই সত্যটিকে স্পষ্ট দৃঢ়মূল ধারণা ও বিশ্বাসে যুক্তিসহ গ্রথিত করতে হবে। যুক্তিসহ এই কারণে যে, একজন লেখককে যুক্তি প্রদর্শন করতে হয়। একজন লেখক যুক্তিবিষয়ক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন যদি তিনি মাওলানা আবুল আলা মওদূদীর (রহ.) এর রচনাগুলো গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পাঠ করেন। সঙ্গে সঙ্গে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ এবং অনুষঙ্গ হিসাবে মাওলানা আকরম খাঁ রচিত মোস্তফা চরিত, সাহাবা কেরাম (রা.) দের জীবনী ইত্যাদি পাঠ করেন। পৃথিবীর সবকিছু নির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী ও কল্যাণময় হয়ে ওঠে। পূর্ণ স্বাধীনতা কখনো কল্যাণ বয়ে আনে না। মানুষের চিন্তাকেও নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে থেকে ধাবিত করতে হয়। যতো বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসাবিদ, অঙ্কবিধ, যতো শ্রদ্ধাভাজন নেতা, সমাজসেবক সবাই চিন্তা করেছেন নির্দিষ্ট গন্ডিতে এবং সেই বন্ধনেই সফল হয়েছেন। যারা চিন্তার কোনো বন্ধন মানেন না তারা নিজেরা যেমন বিভ্রান্ত, অন্যকেও ভ্রান্ত পথে তারা চালাবার চেষ্টা করেন। আসলে তারা মানবতার জন্য অকল্যাণকর। বিক্ষিপ্ত মাটি তখনই কার্যকরী হয় যখন তা একটা নির্দিষ্ট বন্ধনের খাপে ভরে ইট তৈরি হয়। আমরা যা কিছু দেখি, ব্যবহার করি তার সবই নির্দিষ্ট বন্ধনে আবৃত। চিন্তাকেও একটা সত্য ও সঠিক বন্ধনের আওতায় লালন করলেই তা কার্যকরী, কল্যাণকর ও সৃজনশীল হয়ে ওঠে। আর সেই সত্য ও সঠিক বন্ধনটি হলো ইসলাম। পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর হাদীস।

উপরোক্ত আলোচনার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে এটুকু নিশ্চিন্তে ও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, চিন্তা-ভাবনা, অনুভব, উপলব্ধি, অনুধাবন ক্ষমতা এবং মন-মস্তিষ্ক ও হৃদয়াবেগকে জাহেলিয়াতের বিক্ষিপ্ততা, বিশৃঙ্খলা ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত এবং পবিত্র করে ঈমানের চিরন্তন পবিত্র বন্ধনে বন্দি হতে ঈমানের ওপর ভিত্তি করেই পৃথিবীকে, মানুষকে, প্রাণী জগৎকে এবং বস্তুকে দেখতে হবে, ভাবতে হবে।

আপাতত দৃষ্টিতে জাহেলিয়াতের কোনো কর্মপদ্ধতিকে ভালো বা কল্যাণময় মনে হতে পারে, কিন্তু সেই ভালোর মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে অকল্যাণের পাহাড়। ইসলামের ভালো ও কল্যাণময়তা দিয়েই তাকে যাচাই করে নিতে হবে, তবেই প্রকৃত ভালো ও কল্যাণময়তার সন্ধান পাওয়া যাবে। কারণ জাহেলিয়াতের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আর ইসলামের সর্বব্যাপী উদার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

ছোট্ট একটা মাত্র উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টির সঠিক রূপ ধরা পড়ে- যেমন নায়ক কোনো বস্তিতে গিয়ে খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ বিলিয়ে দেয় গরিবদের মধ্যে

www.bjilibrary.com

[বাস্তবে রাজনীতিবিদরা যেমনটি করেন]-এর পরিণামে দেখা যায় দর্শকরা নায়কটিকে ভালোবেসে ফেলে। তার কান্নায় কাঁদে, তার হাসিতে হাসে, তার কষ্টে কষ্ট অনুভব করে। এমন কি নায়কের এমন সব কর্মে নায়িকাও তাকে ভালোবেসে ফেলে।

জাহেলী দৃষ্টিতে নায়কের এই কাজটি ভালো কাজ নিঃসন্দেহে। কারণ জাহেলী বুদ্ধিজীবী ও নেতারা বলেন, মানুষ এতে গরিবদের সেবা করতে প্রেরণা পাবে। গরিবরাও উপকৃত হবে, এই ধরনের নানাবিধ যুক্তি দেখিয়ে জাহেলী দার্শনিক বুদ্ধিজীবী ও শাসক নেতাদের মতামত পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। জীবনের সকল দিক এমনকি শিশু থেকে তাবৎ মানুষের মন-মস্তিষ্ক, চিন্তাধারার রঙ, রূপ, রস, আবর্তন ইত্যাদি নিয়ে যে মনোবিজ্ঞান নামক পুস্তকাদি রচিত হয়েছে যা কলেজ ভার্সিটিতে পড়ানো হয় তার মধ্যে মানুষের আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, বিরক্তি, রাগ, হিংসা-বিদ্বেষ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা বিস্তারিত মতামত পেশ করেছেন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এমনিভাবে, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতিবিষয়ক পুস্তকাদি এক কথায় মানুষের মানবিক নৈতিক ও আদর্শিক বিষয়ে যতো দিক আছে- যা ঐসব পুস্তকাদির মাধ্যমে ভালো, কল্যাণময় হিসেবে সর্বজন গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা চলছে বিগত তিন শতাব্দি থেকে, আপাতত দৃষ্টিতে তার কল্যাণকারিতা বিশেষ কিছু শ্রেণীর মধ্যে বিচরণ করলেও পৃথিবীর কোনো অংশেই বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তার কল্যাণকারিতা চোখে পড়েনি। মানুষ শুধু আশায় থাকে হয়তো তাদের ভাগ্যেও কল্যাণকারিতা জুটবে। কিন্তু গভীরভাবে ইসলামী মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক পুস্তকাদি অধ্যয়ন করলে বোঝা যাবে, জাহেলী সমস্ত মতবাদ ও নিয়ম-প্রথা, রসম-রেওয়াজ ভুল এবং ব্যর্থ। আজও ইসলামী মতবাদ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আইন-কানুন সফল এবং কেয়ামত পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর সমাজে তা সফলতাই বয়ে আনবে। অহংকারী, লোভী, স্বার্থান্ধ, প্রভূত্বপ্রিয় এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতার দোষে দুষ্ট ব্যক্তিরা সমাজের শত্রু, ইসলাম এদের শত্রুজ্ঞান করে এবং এরাও ইসলামকে শত্রুজ্ঞান করে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালায়।

নায়কের উদাহরণটিতে আবার ফিরে আসা যাক- নায়ক যে ভালো কাজ করলো তার ফলে কিছু দর্শক খুশি হলো, নায়িকা তাকে ভালোবাসলো। অর্থাৎ সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নায়কটির মতো হতো চাইলো। নায়কটি পার্থিব স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিলো অর্থাৎ নায়িকাকে পেতে চেয়েছিলো তা সে পেলো। এখন কেউ যদি বলে 'কই, নায়ক তো কোথাও বলেনি যে সে এই কাজ করে নায়িকাকে পেতে চায়, কিন্তু সে রকম উদ্দেশ্য তার ছিলো না।' কিন্তু যদি

www.bjilibrary.com

প্রশ্নকর্তাকে উল্টো প্রশ্ন করা হয় তাহলে নায়ক এমন দান-খয়রাত করলো কেনো? গরিবরা উপকৃত হবে বলে? সে নিজে তৃপ্তি পাবে বলে? লোকজন তাকে সম্মান দেবে বলে? প্রশ্নকর্তা হয় তো বলবেন, হ্যাঁ। যদি হ্যাঁ অথবা না যাই ধরে নেয়া যায় তার শেষমেষ ফল হবে এই যে, এতে দর্শক ও নায়িকার মনে জন্মাবে শিরক। কোনো বিশেষ মানুষের নিজস্ব আদর্শের ওপর শর্তযুক্ত অগাধ ভক্তি- শ্রদ্ধা, যা পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করবে মানুষ এবং মাকড়সার জালের মতো ফিতনা জন্ম নেবে মানুষের অন্তরে। সমাজে তার প্রকাশ ঘটবেই। শিরকবাদী মানুষ শিরক উদ্ভুত ফ্যাসাদে লিপ্ত হবে। নেতাপূজা, ব্যক্তিপূজা, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি, বিদ্বেষপরায়ণ জনগোষ্ঠী তৈরি, সঙ্কীর্ণ চিন্তার প্রসার, মানুষকে সফলতার মাপকাঠিতে শ্রদ্ধাভাজন করে তোলার পরও সংকীর্ণ স্বার্থ আদায়ই হয় তার মূল টার্গেট- নায়িকাকে পাওয়া, মানবসেবা নয়। বিচার করা হয় না মানুষটি কোন পথে কিভাবে সফল হলো। আদি রসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরকে আদর্শ মনে করা তাদের মতো ইন্দ্রিয়পূজারী হতে চাওয়া, মানুষের অবাধ স্বাধীনতা স্বীকার করা, এর ফলশ্রুতিতে সমাজে অস্থিরতা ও হিংস্রতার ব্যপ্তি ঘটানো এসবই জাহেলী ভালো ও কল্যাণময়তার প্রকাশ্য রূপ এবং ফসল। দর্শক সহজেই শিখে যায় উদারতার ভান করে কী করে নায়িকাকে আকৃষ্ট করা যায়।

এখানে দেখা যাচ্ছে, নায়ক পার্থিব স্বার্থ হাসিলের শর্তে ভালো কাজ করছে। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ মানুষের শর্ত হলো তুমি এই ধরনের কাজ করলে আমরা তোমাকে বরণ করবো। অথচ ইসলাম এই কাজ করতে বলে 'শর্তহীন' চিত্তে, আল্লাহকে ভালোবেসে, মানুষ ও মানবতার কল্যাণের জন্য। প্রত্যেক নবী-রাসূলই এই আহবান জানিয়েছেন এবং শর্তহীনভাবে ভালো কাজ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে হাজার রকমের লোক হাজার ধরনের ভালো ভালো কথা বললেও বা ভালো ভালো কাজ এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তার ফল দাঁড়ায় এমন যে, পাত্র একদিকে ভরলে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, সেদিকে চাপলে এদিক দিয়ে উপচে পড়ে যায়। কোনোদিকেই সামাল দেয়া যায় না। বহুজাতিক কোম্পানির ওষুধের মতো এক রোগ সারলেও অন্য রোগ ধরে।

জাহেলী মানুষের ভালোবাসার মধ্যেও কোনো কল্যাণকারিতা নেই। কারণ জাহেলিয়াতের সব ভালো ও কল্যাণকারিতা ঈমানহীন ও স্বার্থান্ধ। উল্লিখিত নায়ক যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য দান খয়রাত করতো তবে নায়িকা এবং দর্শকরাও আল্লাহ আকবর বলে ধ্বনি তুলতো। তারা আর শিরকে লিপ্ত হতো না এবং সবার মনে এই আগ্রহই জন্মাতো যে, তারা আল্লাহর জন্যই দান-খয়রাত

www.bjilibrary.com

করবে। তখন ব্যক্তি নায়ক পূজনীয় হতো না- আল্লাহই যে একমাত্র মালিক একথাই প্রতিষ্ঠিত হতো। আর এই কর্মের জন্য নায়ক নায়িকার রিপু তাড়িত ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতো। নায়িকা ভালোবাসতো আল্লাহকে, পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য দান খয়রাত করা কোনো ব্যক্তিকে নয়। এমনিভাবে সমস্ত দুনিয়ায় ঈমানের সঙ্গে সৎকাজ শুধু কল্যাণই ছড়ায়। ফিতনা ফ্যাসাদ দূরীভূত হয়। তখন হাজার কোটি লোকের হাজার কোটি ভালো কথা ও ভালো পদক্ষেপ নেবার দরকার হয় না- তখন একজন আবু বকর (রা.) অথবা একজন হযরত ওমর (রা.)-এর একটি কথাই ডালপালা বিস্তার করে সমস্ত পৃথিবীতে কল্যাণের শীতল বৃষ্টিপাত ঘটাতো এবং আজও ঘটাবে ইনশাআল্লাহ। জাহেলিয়াতের প্রতিটি ভালোকে গভীরভাবে চিন্তা করলে তার ভিতরের সমস্ত অকল্যাণকারিতা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।

আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা আর জ্ঞানের বাইরেও বহুবিদ মন্দ এবং অকল্যাণ রয়েছে যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও আমাদের জ্ঞানের বাইরে, এখনো উদঘাটিত হয়নি এমন বহু ভালোর মধ্যে খারাপ রয়েছে। তাই এমন সব বিষয় নিয়ে লিখতে হলে সেখানে অন্ধভাবে ঈমান সহযোগে তা লিখতে হবে, যা আল্লাহপাক হুকুম করেছেন। তাহলে অবশ্যই সেই সব রচনার কল্যাণকারিতা প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে চিরন্তন স্পর্শ ফেলবে। শুধুমাত্র লেখককে চারটি বিষয় আস্থা রাখতে হবে-

১. আল্লাহ, আখেরাত ও রিসালাতের প্রতি পূর্ণ ঈমান।

২. আল্লাহর সঙ্গে লেখকের নিজস্ব সম্পর্ক দৃঢ়তর করা।

৩. রচনায় বা গল্পে, পরিবেশ, চরিত্র, ঘটনা ও সংলাপ রচনায় নীতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষায় আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ। যেমনঃ পুত্র কখনো পিতার কাঁধে হাত রেখে বলবে না- হ্যালো ড্যাড, আমি ঐ মেয়েকে ভালোবাসি। ইসলাম পিতাপুত্রের বন্ধুত্ব সম্পর্ক রক্ষার কথা বললেও সেখানে নৈতিকতার বন্ধন আছে। পুত্র পিতাকে সম্মান করবে, ভয় করবে, মান্য করবে এবং লজ্জা করবে- এটাই ইসলামী নৈতিকতা। জাহেলিয়াত এই নৈতিকতাকে অনুসরণ করে এসেছে দীর্ঘকাল। এখন জাহেলিয়াতের চাকচিক্যে সবকিছু ভুলে গিয়ে এই অনৈতিকতাকে ইসলাম অনুসরণ করতে পারে না। এ ধরনের অনৈতিকতায় পরিবার ও সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

৪. চরিত্রগুলির আচার-আচরণ, লেন-দেন, কথা-বার্তা সংযোজনে পরকালকে সামনে রাখতে হবে। মোটকথা, আল্লাহর আইনকে মান্য করা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা, তাকে সমর্থন করা, অনুসরণ করা একজন লেখকের অবশ্যই ফরজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর প্রতিটি আইনের সামনে মাথা নত করে দিয়েছেন এবং মান্য করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন।

www.bjilibrary.com

উক্ত বিষয়গুলি অধ্যবসায়, অনুশীলন ও সাধনার মাধ্যমে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারলেই তার রচনার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে তা লক্ষ্য করা যাবে বা ফুটে উঠবে। লেখক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলি একান্ত প্রয়োজন। এতোক্ষণ যে যে বিষয়ের ওপর আলোচনা হলো- যেমন সংস্কৃতি সংক্রান্ত গণমাধ্যমের জন্য চারটি মৌলিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য, চারটি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও চারটি বিষয় ভালো করে রপ্ত করা, বুঝা, অনুধাবন ও আত্মস্থ করার পর লেখককে ভাবতে হবে এই আদর্শকে তিনি প্রতিটি ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কারণ আল্লাহপাকের ঘোষণা অনুযায়ী মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার মূলমন্ত্র অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন পৌছে দিয়ে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের পথে ডাক দেবার দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত মনে মস্তিষ্কে এই বিশ্বাস গেঁথে নেবার পর লেখার জন্য পাঁচটি মৌলিক উপাদান তাকে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে।

১. পার্থিব জীবন সম্পর্কে লেখকের ধারণা।

২. লেখকের জীবনের চরম লক্ষ্য।

৩. লেখকের বুনিয়াদী আকীদা ও চিন্তাধারা।

৪. সংগঠনিকভাবে লেখক প্রশিক্ষিত কি না।

৫. সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে লেখকের সম্যক ধারণা আছে কি না।

দুনিয়ার প্রত্যেক সংস্কৃতি এই পাঁচটি মৌলিক উপাদান দিয়েই গঠিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, ইসলামী সংস্কৃতিও সৃষ্টি হয়েছে এই উপাদানগুলোর সাহায্যেই। [মাওলানা মওদূদী (রহ.)] ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা।

প্রবন্ধের প্রথম থেকে আলোচিত গুণ বৈশিষ্ট্যগুলো এবং উপরোক্ত পাঁচটি উপাদানকে সমন্বয় ঘটিয়ে এক একজন লেখক যদি নিজেকে প্রস্তুত করেন তবে চলচ্চিত্র ও মিডিয়া ইসলামী সংস্কৃতির জোয়ার আনতে পারবে, যে জোয়ারে ভেসে যাবে জাহেলীয়াতের সমস্ত অপসংস্কৃতির শয়তানি খেলা।

আগ্রহী পাঠকদের সুবিধার্থে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরোক্ত পাঁচটি মৌলিক উপাদানের তিনটি উপাদানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানার জন্য তারা মাওলানা মওদূদী রচিত 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' বইটি পড়তে পারেন। বাকি দুইটি উপাদান যথা 'ব্যক্তি সংগঠন' যা আমি 'সাংগঠনিকভাবে লেখক প্রশিক্ষিত কিনা' হিসেবে উল্লেখ করেছি এবং সমাজব্যবস্থা' সম্পর্কে জানার জন্য মাওলানা তাঁর রচিত 'হাকীকত সিরিজ' এবং 'ইসলামের জীবন পদ্ধতি' পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছেন।

www.bjilibrary.com

যারা চলচ্চিত্র বা মিডিয়ার জন্য লিখতে আগ্রহী তারা এই প্রবন্ধের অন্যান্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের পাশাপাশি অবশ্যই ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, হাকীকত সিরিজ এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতি পড়বেন, বারবার পড়বেন।

একজন লেখক যদি যথার্থ জ্ঞানলাভ করতে পারে তবে মিডিয়ার জন্য তার লেখার মধ্যে কোনো বিকৃতি থাকবে না। আর যথার্থ জ্ঞান বলতে একমাত্র আল্লাহপাকের কুরআনের জ্ঞান। কুরআনের জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো উৎসের জ্ঞান ত্রুটিযুক্ত। ত্রুটিযুক্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে বলেই তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। কল্যাণ থাকলে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন হতো না। অতএব লেখককে কুরআন ও হাদীস বারবার অর্থসহ বুঝে পড়তে হবে।

আগেই বলেছি, জাহেলী চলচ্চিত্র বা মিডিয়ার প্রদর্শন ইসলামী মিডিয়ার মডেল বা মানদণ্ড হতে পারে না। ইসলাম একটি আদর্শ একটি চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। অন্ধকার নেমে এলে যেমন আলো জ্বালাতে হয়, জাহেলী সমাজে তেমনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আর ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা লিপ্ত তারা যা কিছু প্রচেষ্টা চালাবে তা ঐ ইসলামী আদর্শ মোতাবেক। ভিন্ন আদর্শে ইসলাম প্রতিষ্ঠা চলে না। অতএব আদর্শটিকে আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে। আর শুধু বুঝলে হবে না- পূর্ণাঙ্গ ঈমানের সাথে বুঝতে হবে। মেনে নিতে হবে। পালন করতে হবে।

আন্দোলনে শরিকদের শুধু প্রতিভা থাকাটাই যথেষ্ট নয় বরং ঈমানের সঙ্গে জেনে বুঝে প্রতিভার বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। এজন্য তাফহীমুল কুরআন, ইসলামী সাহিত্য, রসূল (সা.)-এর জীবন ও সংগ্রাম, সাহাবা (রা.) দের জীবন ও কর্ম গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। এছাড়াও নিম্নের বইগুলো পড়া যেতে পারে-

১. উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান
২. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন
৩. ইসলমের রাজনৈতিক মতবাদ
৪. শান্তির পথ
৫. ইসলামের শক্তির উৎস
৬. ইসলাম ও জাহেলিয়াত
৭. মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচি
৮. ইসলামে নৈতিক দৃষ্টিকোণ
৯. পলাশী থেকে বাংলাদেশ
১০. পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন
১১. ইসলামী বিপ্লবের পথ

www.bjilibrary.com

১২. সত্যের সাক্ষ্য

১৩. রাসায়েল মাসায়েল

অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে শেখ সাদী (রহ.)-এর গুলিস্তা, বোস্তা এবং ইমাম গাজ্জালী (রহ.) রচিত পুস্তকাদি লেখকের জন্য উপকারী গ্রন্থ। যদিও ইমাম গাজ্জালী (রহ.) রচিত পুস্তকাদীতে বর্ণিত কিছু হাদীস বিতর্কিত, তাই সুবিধার্থে সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করতে হবে।

মহান আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চেয়ে উক্ত বিষয় এবং পুস্তকগুলো পড়ে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হবে- সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে চলচ্চিত্র ও মিডিয়ার জন্য লেখালেখি করলে সেই লেখাগুলো ইসলাম সমর্থিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী ও জ্ঞানদাতা এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

www.bjilibrary.com

সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ন

সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের পার্থক্য

সাহিত্যের যেমন শ্রেণীভাগ আছে চলচ্চিত্রেরও তেমনি শ্রেণীভাগ আছে। সাহিত্যের মধ্যে আছে উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, জীবনী, প্রবন্ধ, ইতিহাস বর্ণনা এবং বিশ্লেষণমূলক সাহিত্য ইত্যাদি।

অন্যদিকে চলচ্চিত্রে আছে পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র [উপন্যাস ও গল্পের মত] তথ্যচিত্র, প্রামাণ্য চিত্র, বিজ্ঞাপন চিত্র, খবর চিত্র ইত্যাদি

আলোচ্য রচনাটি হচ্ছে পূর্ণ ও স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র সম্পর্কে। এ দু'টি চলচ্চিত্র হিসাবে পৃথিবীতে বেশি পরিচিত এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। এই দু'শ্রেণীর চলচ্চিত্র উপন্যাস সাহিত্য ও গল্পসাহিত্য নির্ভর। আর উপন্যাস ও গল্প হচ্ছে কাহিনীনির্ভর। অপরদিকে কাহিনী তৈরি হয় ঘটনা ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের কাহিনী সাধারণত ঘটনা এবং চরিত্রকে ভর করে অগ্রসর হয় এবং পরিণতি লাভ করে। এদিক দিয়ে সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মূলগত ঐক্য একই উৎসজাত। আর আধুনিক মানুষের প্রিয় শিল্প হলো এ দুটি- চলচ্চিত্র এবং উপন্যাস। একই উৎসজাত হলেও এ দুটির ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন-

১. উপন্যাস একজন পাঠককে কল্পনার মাধ্যমে উপলব্ধি করায় আর চলচ্চিত্র তা দেখিয়ে ও শুনিয়ে উপলব্ধি করায়।

২. উপন্যাস চরিত্র ও ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্তাকে উদ্ঘাটন করে, আর চলচ্চিত্র উপন্যাস থেকে তার প্রতীকীরূপ ধার করে এবং তা ভাষা ও শব্দসহ পরিবেশন করে।

৩. উপন্যাস পাঠককে যে ধারণা দেয়, চলচ্চিত্র দর্শকদের কাছে তা-ই দৃশ্যমান করে তোলে।

www.bjilibrary.com

৪. উপন্যাস ভাষার যথেচ্ছ প্রয়োগে বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ দেয়, অন্যদিকে চলচ্চিত্র তা শুধু পরিবেশন করে।

৫. উপন্যাস রচনা করেন লেখক কল্পনাকে আশ্রয় করে কলমের সাহায্যে। অপরদিকে চলচ্চিত্র রচনার সময় পরিচালক বাস্তবতাকে আশ্রয় করে লিখেন ক্যামেরার সাহায্যে।

৬. উপন্যাসের লেখক অক্ষরের পর অক্ষর লিখে শব্দ সাজিয়ে রচনা করেন- চলচ্চিত্রের লেখক পটের পর পট্ তুলে সিন সাজিয়ে চলচ্চিত্র রচনা করেন।

৭. কখনো কখনো একটি উপন্যাসকে তার ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনার ফলে চলচ্চিত্রের মত মনে হয়। আবার কখনো কখনো একটি চলচ্চিত্রকে ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনার কারণে উপন্যাসের মত মনে হয়।

বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে ভাবলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় চলচ্চিত্র বাস্তবের বহিরাঙ্গ নিয়ে চর্চা করে, বাস্তবের অন্তর্লোকে পৌছানোর ক্ষমতা চলচ্চিত্রের নেই।

চলচ্চিত্রের আশ্রয় সাহিত্য

কিন্তু বিখ্যাত চলচ্চিত্র গবেষক লুইজি ক্রুকস্ বলেন, "চলচ্চিত্রকে বাইরের জগতের শিল্প বা বাস্তবের বহিরাঙ্গের শিল্প হিসাবে গণ্য করলে ভুল হবে। শুধুমাত্র মানুষের মুখ বা দেহের বর্ণনাত্মক ভঙ্গিই নয় বরং চলচ্চিত্র তাই, যা তীব্র একাকীত্ব পীড়িত অন্তর্লোকের যে চিন্তা, সেই চিন্তার ভঙ্গি সৃষ্টি করে।"

ক্রুকসের মতামতকে প্রথমে কেউ সমর্থন করেননি, কোন বিতর্কও হয়নি। বরং সমস্ত চলচ্চিত্র বোদ্ধারা মনে করেছেন যে, আসল বাস্তবতা হলো, চলচ্চিত্র তার জন্ম থেকেই উপন্যাস হতে তার উপাদান-উপকরণসমূহ অকাতরে সংগ্রহ করে আসছে যার বহিরাঙ্গই প্রধান।

উপন্যাস থেকেই চলচ্চিত্র তার গঠন কাঠামো সংগ্রহ করেছে একথা ধ্রুব সত্য। গ্রহণ করেছে চরিত্রের ধারাবাহিকতা, সময়, কাল, গতি, প্রতীক এবং বিভিন্ন নান্দনিক অনুষঙ্গ। যেহেতু চলচ্চিত্রের সংগ্রহ উপন্যাসকেন্দ্রিক, তাই নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, ইতিহাস, জীবনী ইত্যাদি থেকে চলচ্চিত্রের সংগ্রহ কি হবে, কি প্রকারের হবে, কতটুকু হবে এবং কতটুকু হওয়া উচিত সেসব এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। সে সম্পর্কে পৃথক আলোচনা প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান আলোচনা শুধুমাত্র উপন্যাস ও গল্প সাহিত্য বিধায় এগুলো প্রসঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন।

www.bjilibrary.com

চলচ্চিত্র ও সাহিত্য : অবিচ্ছিন্ন পৃথক সত্তা

উপন্যাসের যে সব বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে অন্তর্লোক তথা মনোজগৎই প্রধান যা চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য কিন্তু সম্ভব।

বিশ্ববিখ্যাত সব চলচ্চিত্র গবেষকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত লুইজি ব্রুকসের মতামতকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন কলম দিয়ে যে সব বৈশিষ্ট্যকে প্রধান করে উপন্যাস রচনা করা যায়, তেমনি ক্যামেরা দিয়ে উপন্যাসেরই সেইসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলচ্চিত্র রচনা করা সম্ভব। অর্থাৎ অন্তর্লোকের আবর্তন বিবর্তন, তার ভঙ্গিমা বা আভিজাত্যকে এবং চিন্তা-চেতনাকে নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করা যায়। আমাদের দেশে এসব পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ যেমন নেই তেমনি নেই যোগ্য, মানসিকতার গবেষক-পরিচালক। এমনকি উন্নত দেশের যারা গবেষক নির্মাতা তাদের চলচ্চিত্র দেখে বিশ্লেষণ করার কোন চেষ্টা ও সুযোগ আমরা তৈরি করতে পারিনি। তাই চলচ্চিত্রকে এক ধরনের গৎ বাঁধা অপসংস্কৃতির বাহক বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়।

অথচ উন্নত দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা অপর উন্নত দেশে গিয়ে চলচ্চিত্রের উন্নত ভাবধারা ও টেকনিক শিখেছেন এবং নিজের দেশের চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন, চলচ্চিত্রের খাতকে উন্নত করে সাধারণ মানুষের মনোজগতের সুপ্ত উন্নত চিন্তা চেতনাকে প্রকাশ করতে এমন ভূমিকা রেখেছেন, যেমনভাবে গভীর 'খনি' থেকে খনি শ্রমিকরা হীরা মণিমুক্তা বের করে আনে। রাশিয়া থেকে লেনিন যদি ফ্রান্সে গিয়ে চলচ্চিত্রের ব্যাপক ও বিশাল ক্ষমতা প্রত্যক্ষ না করতেন তবে রাশিয়াতে ফিরে তিনি চলচ্চিত্রের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিতেন না। মজার ব্যাপার হলো, উন্নত দেশের চলচ্চিত্র গবেষকরা অন্যদেশে গিয়ে প্রযুক্তি বা টেকনিক্যাল বিষয়ে উন্নত শিক্ষালাভ করেছেন ঠিকই, কিন্তু কেউ-ই ভাব বা মতাদর্শ বিষয়টিকে গ্রহণ করেননি।

লেনিনই বিখ্যাত পরিচালক, গবেষক সের্গেই আইজেনস্টাইনকে আমেরিকা ও ফ্রান্সে পাঠিয়েছেন। অথচ আইজেনস্টাইন সারাজীবন কার্লমার্কসের সাহিত্যরস তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রে 'সিঞ্চিত করেছেন। আমেরিকা বা ফ্রান্সের পুঁজিবাদী ভাব বা মতাদর্শ তিনি গ্রহণ করেননি।

যাইহোক, বিখ্যাত পরিচালকরা তাদের নির্মিত চলচ্চিত্রকে সাহিত্যের মত রচনা করেই যেমন বিখ্যাত হয়েছেন, তেমনি দর্শকের হৃদয়ানুভূতিতে নতুন চিন্তা-চেতনার সুর তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

ফ্রান্সে ১৯৫৯ সালে বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক অ্যালা রেনে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেন, যার নাম 'হিরোশিমা মন আমুর' এবং তারপর 'লাস্ট ইয়ার অ্যাট

www.bjilibrary.com

মরিয়েনবাদ' ছবিটি তৈরি করেন। রেনের উদ্দেশ্য ছিল যে আধুনিক সাহিত্য এবং সিনেমা- এ দু'টির মিলন ঘটানো। তিনি চেয়েছিলেন এমন ছবি আমি তৈরি করবো যা দেখলে মনে হবে 'পাঠ করছি' প্রত্যক্ষ করছি না। তাঁর চলচ্চিত্রটিও তেমনি হয়েছিল যা চোখে দেখার চেয়ে উপন্যাস পড়ার মতো মনে হয়েছিল। যার জন্য রেনের চলচ্চিত্র উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। যদিও এত এত উপন্যাস লেখা হয়, সব উপন্যাস যেমন সাহিত্য হয় না, তেমনি সব ছবিও চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে না।

সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র

তবুও আরো দু'একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে : ভারতের মুম্বাইতে ৭০ দশকের মাঝামাঝি দুটি চলচ্চিত্র তৈরি হয় একটি হলো পরিচালক শ্যাম বেনেগালের "অংকুর" এবং অন্যটির পরিচালক মোজাফফর খানের 'ওমরাও জান'। এই দুটি চলচ্চিত্র পাঁচটি শাখায় পাঁচটি করে জাতীয় পুরস্কার পায়। চলচ্চিত্র দুটি এতই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে সেই মারদাঙ্গা চলচ্চিত্রের যুগে উক্ত দুটি চলচ্চিত্রের অনুকরণে আরো বহু চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল যা মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্রের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল এবং উক্ত দু'জন পরিচালক ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। দুটি চলচ্চিত্রই মনে হয়েছে বাঁধাই করা উপন্যাসের মত।

এসব ছাড়াও উপন্যাসের মত পাঠ করা যায় এমন ধরনের বহু চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে ভারতে- যেমন, মেহবুব পরিচালিত "মাদার ইন্ডিয়া", কামাল আমরোহী পরিচালিত 'পাকিজা', কে. আসিফ পরিচালিত 'মোগল-ই-আযম', গোবিন্দ নিহালনী পরিচালিত 'আক্রোশ', কে. ভাগ্যরাজ পরিচালিত "আখেরী রাস্তা', রাজন সিপ্পি পরিচালিত "শক্তি"... এমন অনেক অনেক ছবি উপন্যাস সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

ইউরোপ-আমেরিকায় যারা উপন্যাসকে আশ্রয় করে বিশ্বখ্যাত হয়েছেন তাদের মধ্যে ডি. ডব্লু গ্রিফিথ অন্যতম। গ্রিফিথকে আধুনিক চলচ্চিত্রের জনক বলা হয়। ক্যামেরার বিভিন্ন ট্রিকস্, সম্পাদনা, ক্লোজ আপ শট্ এবং তার ব্যবহার মিডি শট, লং শট, টপ শট, ট্রলি শট্ এবং এসবের ব্যবহার- সবই গ্রিফিথের আবিষ্কার। এসব ব্যাপারগুলো চলচ্চিত্রের ব্যাকরণের ভিত্তি। গ্রিফিথ অত্যন্ত সচেতনভাবে বিখ্যাত সাহিত্যিক চার্লস্ ডিকেন্সের সাহিত্যের বর্ণনাকে অনুকরণ করতেন।

গ্রিফিথের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হলো বার্থ অফ এ নেশন। আরেকজন পরিচালক জর্জ মেলিয়ে, তিনি জুল ভের্ন-এর কল্প বিজ্ঞান সাহিত্য থেকে অকাতরে

www.bjilibrary.com

চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন। রাশিয়ান চলচ্চিত্র নির্মাতা "সের্গেই আইজেনস্টাইন" তাঁর সমস্ত চলচ্চিত্রে কার্লমার্কসের সাহিত্য থেকে রস সঞ্চয় করে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি কার্লমার্কসের "ডাস্ ক্যাপিটালের" চলচ্চিত্রায়নের স্বপ্ন দেখে গেছেন। এ ছাড়াও রয়েছেন রাশিয়ান পরিচালক পুদভোকিন, তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র ম্যাক্সিম গোর্কির "মাদার"।

১৯৫১ সালে জাপানের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক রিউনোসুকে আকুতাগওয়ার-এর সাহিত্য নিয়ে পরিচালক কুরোশাওয়া তৈরি করেন 'রশোমন'। এই চলচ্চিত্রটি সারা বিশ্বে হৈ চৈ ফেলে দেয়। পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত সাহিত্যকর্ম নিয়ে পাশ্চাত্য বিশ্বে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্রগুলি তৈরি হয়েছিল। আজও যা সমান জনপ্রিয়তা নিয়ে বিদ্যমান এবং চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীদের জন্য ডিকশনারী হিসাবে চলমান।

আমাদের দেশেও উক্ত সময়ে প্রচুর সাহিত্য নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে এবং যা সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রথম সাহিত্য নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করেন এ.জে. কারদার । মানিক বন্দোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস "পদ্মা নদীর মাঝি" অবলম্বনে উর্দু চলচ্চিত্র "জাগো হুয়া সাভেরা"। তখন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের অবর্ণনীয় এবং অমানবিক অত্যাচার নির্যাতনের ফলে সৃষ্ট তীব্র অসন্তোষের কারণে নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান সরকার চলচ্চিত্রটির টাইটেলে হিন্দু সাহিত্যিক মানিক বন্দোপাধ্যায়ের নাম ব্যবহার করতে দেয়নি। উক্ত উপন্যাসটি অবলম্বনে বাংলাদেশে ভারতীয় পরিচালক গৌতম ঘোষ চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন, যা সুধীমহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

আসল কথা হলো বাংলাদেশে সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রগুলিই জনপ্রিয়তা পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। পুঁথি সাহিত্য, লোক সাহিত্য ও ময়মনসিংহ গীতিকা ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত কাহিনী রূপবান, ভেলুয়া সুন্দরী, সাত ভাই চম্পা, বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না, সুয়োরাণী দুয়োরাণী, কুচবরণ কন্যা ইত্যাদি অসংখ্য চলচ্চিত্র জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

পরিচালক সুভাষদত্ত রোমেনা আফাজের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি করেছিলেন "কাগজের নৌকা" ১৯৬৬ সালে। ১৯৬৭তে জহির রায়হান তৈরি করেন নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের উপন্যাস "আনোয়ারা"। এরপর একে একে পরিচালক কামাল আহমেদ তৈরি করেন আকবর হোসেনের উপন্যাস অবলম্বনে "অবাঞ্ছিত", ডা. নিহাররঞ্জন গুপ্তের "লালুভুলু"। একই সাহিত্যিকের 'বধূ' অবলম্বনে সি.বি জামান করেন 'ঝড়ের পাখী'। অদ্বৈত মল্ল বর্মনের উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' করেন ঋত্বিক ঘটক। আলাউদ্দিন আল আজাদের তেইশ নম্বর তৈলচিত্র'

www.bjilibrary.com

অবলম্বনে সুভাষ দত্ত তৈরি করেন 'বসুন্ধরা'। শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সারেং বউ' করেন আবদুল্লাহ আল মামুন। আবু ইসহাকের উপন্যাস "সূর্য দীঘল বাড়ী" অবলম্বনে চলচ্চিত্র তৈরি করেন শেখ নিয়াকত আলী ও মসিহউদ্দীন শাকের। আমজাদ হোসেন তার নিজের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি করেন, 'নয়নমণি', 'গোলাপী এখন ট্রেনে'। চাষী নজরুল ইসলাম শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র তৈরি করেন, 'চন্দ্রনাথ', দেবদাস, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' অবলম্বনে করেন 'বিরহ ব্যথা' নাম দিয়ে। মহিউদ্দীন ফারুক করেন শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ'। নায়ক পরিচালক বুলবুল আহমেদ করেন শরৎচন্দ্রের 'রাজলক্ষী শ্রীকান্ত'। হালে রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি', 'সুভা' ইত্যাদি চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন চাষী নজরুল ইসলাম।

অন্যদিকে সত্যজিৎ রায় তো উপন্যাসভিত্তিক চলচ্চিত্র তৈরি করে বিশ্ব চলচ্চিত্র ইতিহাসে অন্যতম গুণী পরিচালক হিসাবে ঠাঁই করে নিয়েছিলেন।

ভারতীয় বিশেষ করে বাঙ্গালী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, বিমলমিত্র, শংকর, বনফুল, বঙ্কিমচন্দ্র, অবধূত, প্রভাত রায়, মতিনন্দি, সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, বাংলাদেশে হুমায়ুন কবির, জসীমউদ্দীন, দিলারা হাসেম, সৈয়দ শামসুল হক, ভারতে হিন্দী ও উর্দু ভাষার সাহিত্যিক- ইসমত চুগতাই, সাদাত হোসেন মান্টো, কৃষ্ণ চন্দর, কে.এ আব্বাস, রাজা মেহেদী আলী খাঁ, রাজেন্দ্র কুমার ত্রিবেদী, কামাল আমরোহী- এবং এরকম আরো অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টিকারী, স্মরণীয় সব চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। ইউরোপে, শেক্সপিয়ার, ডি. এইচ লরেন্স, ভিক্টর হুগো, দস্তয়েভস্কি, ম্যাক্সিমগোর্কীর মত সাহিত্যিকদের উপন্যাস নিয়ে তো আজো চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে।

উক্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে চলচ্চিত্র যুগের সাহিত্যিকরা এত জনপ্রিয় হন যে পরবর্তীকালে তাঁরা এবং তাঁদের উত্তরসূরীরা শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের জন্যই সাহিত্য রচনা করতেন এবং সেটাকেই মূল পেশা হিসাবে তারা গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশে খান আতাউর রহমান, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র করেছিলেন "সুখ-দুঃখ" নামে। ছবিটি সুনাম কুড়িয়েছিল। হালে চিত্রনায়িকা মৌসুমী এবং পরিচালক গুলজার যৌথ পরিচালনায় তৈরি করেছেন নজরুল ইসলামের সাহিত্য নিয়ে 'মেহের নিগার' চলচ্চিত্রটি। নজরুলের গল্প নিয়ে কলকাতায়ও ছবি তৈরি হয়েছিল, নজরুল তাতে অভিনয়ও করেছিলেন, ছবিটির নাম 'বিদ্যাপতি'।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশে এমন অনেক ছবি তৈরি হয় যা ভারত বা পাকিস্তানের কোন ছবিকে অনুকরণ করে। ভারত বা পাকিস্তানের সেই মূল ছবিটি হয়তো তৈরি হয়েছে কোন সাহিত্যকে অবলম্বন করে। মোটকথা সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রগুলি ছাড়া বাকি চলচ্চিত্রগুলি কিসের উপর নির্ভর করে তৈরি হয় এ প্রশ্ন আসতে পারে, একথার উত্তর হলো, বাকি চলচ্চিত্রগুলি সাহিত্যকে অনুকরণ করেই তৈরি হয়। তবে এটা ঠিক যে পঞ্চাশ দশক থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ সাহিত্যিকরা এমন প্রেরণা চলচ্চিত্র থেকে পেয়েছেন যে তাঁরা এমন উপন্যাস লিখতে থাকেন যা থেকে সহজেই চলচ্চিত্র তৈরি হতে পারে অথবা চলচ্চিত্রের একটা কাঠামো দাঁড় হতে পারে।

চলচ্চিত্র ও সাহিত্য বন্ধু-প্রতিম

নির্বাক যুগ থেকেই সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুটি একান্ত কাছাকাছি বন্ধুর মত এগিয়ে চলেছে। যার জন্য অনেক উপন্যাসকে পড়তে পড়তে মনে হয় এটা বুঝি চলচ্চিত্র পড়ছি, আবার অনেক চলচ্চিত্র এমন আছে যা দেখতে দেখতে মনে হয় উপন্যাস পড়ছি, যদিও তেমন ধরনের চলচ্চিত্র আমাদের দেশে হয় না বললেই চলে।

চলচ্চিত্র আসলে কোন মৌলিক মাধ্যম নয়। সংস্কৃতির সবকিছু চলচ্চিত্র ধার করে নিজে সাজে এবং জনপ্রিয় হয়।

চলচ্চিত্রের যখন আবির্ভাব হয় তখন ইউরোপে নৃত্য, সংগীত, চিত্রকলা, নাটক... ইত্যাদি সবই ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। তাই ইউরোপ আমেরিকার চলচ্চিত্রে সেই পৃথকীকরণটা চোখে পড়ে। সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন চলচ্চিত্র সেখানে তৈরি হতে থাকে। কিন্তু চলচ্চিত্রের আবির্ভাবের সময়ে ভারত উপমহাদেশে সংস্কৃতির সব শাখাই ছিল ধ্বংসের শেষ প্রান্তে। তাই চলচ্চিত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'একের ভিতর পাঁচ' গোছের চলচ্চিত্র তৈরি হতে থাকে। অর্থাৎ নৃত্য, সংগীত, চিত্রকলা, নাটক, কবিতা, ফ্যাশন ইত্যাদি সবকিছুরই ছন্দময় সমন্বয় ঘটলো চলচ্চিত্রে। আজ পর্যন্ত তাই-ই চলছে এবং দর্শকরা তাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। চলচ্চিত্র সৃষ্টির প্রথমদিকে ইউরোপ-আমেরিকা এবং উপমহাদেশেও চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ উপন্যাসনির্ভর ছিল। বহু সাহিত্যিক সে সময় চলচ্চিত্রের সঙ্গে লেখক এবং পরিচালক হিসাবে যুক্ত হয়েছিলেন। আজও স্বল্পসংখ্যক হলেও উপন্যাসনির্ভর চলচ্চিত্রই দৃষ্টিনন্দন হয় এবং মানুষের হৃদয়াবেগকে উদ্বেলিত করে।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ গাস্ত বোর্বেজ লিখেছেন, "চলচ্চিত্র ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের অবলম্বন ছেড়ে নিজের স্বাধীন পথে যাচ্ছে। আর চলচ্চিত্র যতই

www.bjilibrary.com

স্বাধীন হচ্ছে, ততই সে সাহিত্যের কাছাকাছি জায়গা করে নিচ্ছে।" তিনি কিছু কিছু চলচ্চিত্রের উদাহরণও দিয়েছেন- [বিষয়টি চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে আসবে বলে উল্লেখ করছি]- যেমন- "সিটিজেন কে এন", "ডেপথ অফ ফিল্ড", দ্য ডায়েরি অফ এ কান্ট্রি-প্রিস্ট"। মূলকথা, পরিচালকরা এসব চলচ্চিত্রকে গল্প বলার উদ্দেশ্যে তৈরি করেননি। বরং মানুষের অন্তরাত্মাকে প্রকাশ করার আগ্রহ নিয়ে তৈরি করেছেন। লুইজি ব্রুকস যে মতামত দিয়েছিলেন উক্ত চলচ্চিত্রগুলিতে তারই প্রতিফলন ঘটেছিল। অর্থাৎ "চলচ্চিত্র তাই, যা তীব্র একাকীত্ব পীড়িত অন্তর্লোকের চিন্তার ভঙ্গি সৃষ্টি করে।" আমরা যে গৎ বাঁধা প্রথাগত চলচ্চিত্র দেখি, আসলে সে সব চলচ্চিত্র দেখে আধুনিক টেকনিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রের মূল্যায়ন করা উচিত নয়। তাহলে শিক্ষার্থীরা ভুল পথে চালিত হবে এবং সেইসব শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে এমনি ধরনের গৎ বাঁধা চলচ্চিত্র উপহার দিবেন। অথচ বর্তমানের অস্থির মানবগোষ্ঠীর আত্মিক উৎকর্ষতার জন্য একদল চলচ্চিত্র নির্মাতার প্রয়োজন যারা মানুষের জন্মগত পবিত্র শিশুর সারল্যভরা সহজাত চিন্তারাশিকে উন্নত ও শক্তিশালী করতে অনবদ্য ভূমিকা পালন করবেন।

ব্যাপারটিকে সহজবোধ্য করার জন্য উপরের আলোচনায় সংক্ষেপে সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক, উদাহরণ এবং যৎসামান্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কোন কাহিনী বা গল্প ছাড়া অর্থাৎ ঘটনা ও চরিত্রের ধারাবাহিকতা ছাড়াও শুধুমাত্র একটি বক্তব্যকে বিষয়বস্তু হিসাবে বা একটি মতাদর্শকে অথবা কোন সাধারণ মানুষ বা কোন সমাজ সংস্কারক মানুষের বর্ণনা অথবা তাঁর অন্তর্লোকের ভাবনা ও চিন্তারাশিকে চলচ্চিত্রায়ন করা সম্ভব- শিক্ষার্থীকে সেই ধারণা দেবার জন্য উপরোক্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

কাহিনী বা গল্প ছাড়া অর্থাৎ ঘটনা ও চরিত্রের নির্ভরতা থেকে চলচ্চিত্রকে যেদিন সরিয়ে অন্তর্লোকের চিন্তার গতিপ্রবাহ, ভঙ্গি বা তার রূপকে পরিস্ফুট করা সম্ভব হবে সেদিনই চলচ্চিত্র স্বয়ং একটি পৃথক সাহিত্য হয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে। যা ইতিমধ্যে সম্ভব করে প্রমাণ করে দিয়েছেন পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্র নির্মাতা ও গবেষকরা।

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : একই দেহ

আমাদের দেশে এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ও পাকিস্তানে যে সব চলচ্চিত্র তৈরি হয় সে সব চলচ্চিত্রের ঘটনাপ্রবাহ, বক্তব্য ও উপস্থাপনার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। মনে হয় চিত্রকলা, স্থাপত্য, সংগীত, উপন্যাস, কবিতা, গল্প, নাটক, নৃত্য- সংস্কৃতির অন্যান্য শাখা যা চলচ্চিত্রে মিশেছে, তার রঙ, রূপ, রস সব একই মৌল ভিত্তির উপর রচিত। শুধুমাত্র দেশগুলির ভৌগোলিক সীমা,

www.bjilibrary.com

জাতিসত্তা, ভাষা পৃথক এবং চিন্তাচেতনা, আদর্শ, মতবাদ সব একই, যেন কোন পৃথক সারসত্ত্বা নেই, যেন আমাদের একই আদর্শজাত সংস্কৃতি অর্থাৎ মুশরেকী, নাস্তিক, জড় এবং তৌহিদ এসব শব্দগুলির একই আদর্শ, একই অর্থ, এসরের আলাদা কোন রূপ নেই, আকার নেই, সত্তা নেই, সকল মতাদর্শের মূল সত্তা যেন একই সরলরেখা ধরে চলছে। কিন্তু আসলে তা সত্য নয়, এবং তা হওয়া উচিত নয়; সুস্থ, সৎ ও কল্যাণময় আদর্শিক সংস্কৃতির রূপ অবশ্যই ভিন্ন হওয়া উচিত। নতুন মানবতা, কল্যাণ, উন্নত, আদর্শ এসব শব্দগুলি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অপমানিত হয়।

সম্ভবত এসব দেশের আইন-কানুনের ভিত্তিভূমি একই উৎসজাত বলে তাদের বাহ্যিক সাংস্কৃতিক ভঙ্গিমা তথা রূপ, রস একই মনে হয়। কিন্তু বৃহৎ মুসলিম জাতিসত্তা এবং বৃহৎ মুশরেক জাতিসত্তার আইন কানুনের ভিত্তিভূমি তো একই উৎসজাত হওয়া উচিত নয়, স্বাভাবিকও নয়।

জীবনযাপন পদ্ধতির ভিত্তিমূল : আইন-কানুন

আইন-কানুন বা নিয়ম-পদ্ধতি যাই বলিনা কেন এগুলিকে ভিত্তি করে মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী, আচার-আচরণ, লেন-দেন, নৈতিকজীবন পদ্ধতি ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে।

নিয়ম-কানুন যদি মানুষের তৈরি হয়, যেমন কমিউনিজম বা পুঁজিবাদ, জড়বাদ বা ভোগবাদ জাতীয় হয় তবে সেসব নিয়ম-কানুনের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী হবে এক এক ধরনের। যেমন একজন তৌহিদবাদী মানুষ ব্যতীত অন্য কারো জন্য ফজরের সময় ঘুম থেকে জেগে ওঠার বাধ্যবাধকতা নেই। [স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তির কথাটা ভিন্ন]। একজন মুসলমান সূর্য ওঠার পূর্বেই উঠবে এবং নামাজ পড়বে। নামাজ ও কোরআন পড়ার পর নাস্তা খাওয়া এবং দিনের কাজ শুরু করা তার প্রতিদিনের রুটিন। তার পরিবারও একই নিয়মের অধীন হবে। রাষ্ট্র নামক সংগঠনটিও যদি একই নিয়মের অধীন হয় তবে অহেতুক বেকার বসে না থেকে অফিসের সময় নির্ধারণ করবে সকাল সকাল। ছুটিও হবে সেই অনুযায়ী। ব্যক্তিটি বা ব্যক্তিবর্গ অফিসে দুর্নীতি করবে না, কারো অধিকার হরণ করবে না, কারণ একদিকে সে মুসলিম, আল্লাহতাআলার আইন মেনে চলতে বাধ্য, অপরদিকে আইন না মানলে পরকালে শাস্তির ভয়ে ভীত এবং রাষ্ট্র নামক সংগঠনটির শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, কারো প্রতি স্বার্থের টানে মনোযোগ না দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর আইন যথাযথ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখে বা অন্যায়কারীকে যথাযথ শাস্তির বিধান পালন করবেই। অফিস ছুটির পর সৎ পথে, ন্যায় পথে সর্বোপরি আল্লাহর

www.bjilibrary.com

পথে আহ্বান করার জন্য দাওয়াতি কাজে সে বেরিয়ে পড়বে। অতএব যার কাছ থেকে ঘুষ খাবে, যাকে ন্যায়পথে ডাকবে তার সঙ্গে কিভাবে সে ন্যায় ও সততার কথা বলবে। সঙ্গত কারণেই তাকেও সৎ হয়ে সমাজে বসবাস করতে হবে। এই নানামুখী প্রেরণা, ও প্রতিবন্ধকতার কারণে ব্যক্তি ও সমষ্টি সৎ হয়ে থাকতে বাধ্য হয়, বরং কোন দুশ্চরিত্রের দুষ্কৃতিকারীও সৎ হয়ে থাকতে বাধ্য হবে।

অন্যদিকে একজন জড়বাদী, নাস্তিক বা ভোগবাদীর পরিবার প্রস্তুত থাকবে একটু বেলা হলে নাস্তা তৈরি করার জন্য। অতএব তার জন্য অফিসের সময় নির্ধারিত হবে বেশ দেরিতে। অন্য সবাইকে সেই দেরিতেই অফিসে আসতে হবে। তাদের সবার পরিবারের সদস্যবৃন্দ একইভাবে অন্যান্য কাজ দেরিতেই করতে অভ্যস্ত হবে। যেকোন মুহূর্তে, যে কোন ব্যাপারে ফাঁকি দেয়া বা অন্যায়ের সুযোগ পেলে তারা সেই অন্যায় বা দুর্নীতি করবেই। তারা অত্যন্ত জটিল বাক্য বিন্যাসে নিজেদের অন্যায়কে ন্যায় হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করবে- যা একমাত্র ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের কাছে ন্যায় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজের বৃহত্তর ক্ষমতাহীন মানুষের কাছে অন্যায় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। এতে একটি দেশ বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, নির্যাতিত হবে এবং শোষিত ও বঞ্চিত হবে।

জড়বাদী ও নাস্তিকরা চাইবে অফিসের বা কর্মস্থলের মহিলা চাকুরে একটু ফ্যাশন সচেতন হোক, কোন প্রকার রাখঢাক না করে খোলামেলা হোক। মহিলাটি তাতেই অভ্যস্ত হবে। তার স্বামী, সন্তানও তাতেই অভ্যস্ত হবে। ধীরে ধীরে মানুষের কুদৃষ্টি শক্তির কাছে সে পরাজিত হয়ে ব্যভিচারের দিকে পা বাড়াবে। একটা নেশার মত তখন নিজের উলঙ্গতাকে নিজেই সে ভালোবাসবে। নিজের উত্তেজনার ধারাবাহিক শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে যে নিয়মের মধ্যে "রাখঢাক" করা অপরাধ সেই নিয়মটাকে অর্থাৎ পর্দা ব্যবস্থা তথা আল্লাহর আইনকে তার কাছে অসহ্য মনে হবে। আবার শারীরিক সৌন্দর্য যাতে অন্যকে আকর্ষণ করে, মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, সেই কারণে ভোগ-বিলাসিতা ও রূপ-দেহ চর্চার উপাদান-উপকরণ ও উৎপাদনকারীরা তাদের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়তে সচেষ্ট হবে। ব্যাপারগুলো নেটওয়ার্কের মত, এক থেকে অন্য- অন্য থেকে সবার মধ্যে এসবের প্রভাব বিস্তৃত হয়ে যায়। একসময় বেঁচে থাকার উপকরণের চেয়ে রূপচর্চার উপকরণের মূল্য বেড়ে যায়। দরিদ্র কৃষক-শ্রমিক শ্রেণী দরিদ্রই থেকে যায় এবং ভোগবিলাসের সামগ্রী উৎপাদনকারীরা ধনী থেকে ধনী হয়। এই ধারাবাহিকতার রূপ হিংস্রতা, সন্ত্রাস, অন্যের অধিকার হরণ, অশ্লীলতা, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবানরা নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন, জ্ঞান ও শিক্ষার মর্যাদা কমে যাওয়া, যোগ্যতার মূল্যায়ন না করা বরং বৃহৎ জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশের তাবেদারী মানসিকতার

www.bjilibrary.com

অধিকারী হওয়া, দাসসুলভ মনোবৃত্তির মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, অর্থ ও ক্ষমতার মাপকাঠিতে মানুষের মূল্যায়ন করা ইত্যাদি সকল প্রকার নিকৃষ্ট নিয়মে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আইন-কানুনের ভিত্তিই মানুষের মননশীলতা, চিন্তা-চেতনা এবং নির্দিষ্ট কিছু নিকৃষ্ট পথে চালিত করে। এবং সমগ্র জাতিকে তারই আবর্তে প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিটি আইন ও নিয়ম একজন মানুষকে আর একজনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে এবং সমস্ত মানুষ ও তাদের কাজকর্ম একটির সঙ্গে আর একটিকে জড়িয়ে ফেলে, এটা একটা চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়ম।

মানুষের তৈরি আইন প্রতিষ্ঠা করলে সমস্ত মানুষ তাতে আবর্তিত হবে, আবার আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করলে সমস্ত মানুষ তাতেই আবর্তিত হবে। মানুষের তৈরি আইন-কানুনকে জীবন চলার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ না করে মানুষ যদি আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত কোরআনের আইন-কানুনকে ভিত্তি করে জীবন পদ্ধতি গড়ে তোলে তবে তার সারা দিনের কাজের ধরনও বদলে যাবে। এক সুন্দর ও কল্যাণময় নৈতিক জীবনে সে অবগাহন করবে, যেমন করেছিল ছয়শত থেকে প্রায় বারশত সাল পর্যন্ত পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ। একজন বা একটি দল বা একটি গোষ্ঠী যখন আল্লাহর আইন-কানুন পরিবার ও সমাজ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করে তখন সম্পৃক্ত অন্যসকল লোকও সেইভাবে তাদের জীবনপদ্ধতি বদলে ফেলতে বাধ্য হয়ে যায়। যেমন একজন হাসপাতালের ডাক্তার যদি আল্লাহর নিয়ম মেনে চলেন তবে তিনি হাসপাতালের ঔষধ চুরি করে বিক্রি করবেন না বা যে ঔষধ প্রয়োগ করলে রোগীর রোগ সারবে তিনি জেনেও সে ঔষধ না দিয়ে রোগকে জিইয়ে রেখে রোগীর অর্থ আত্মসাতের জন্য ভিন্ন ঔষধ দেবেন না। গরীব রোগী চিকিৎসার ব্যয়ভার মিটানোর জন্য তার জমিজমা বিক্রি করবে না, কোন ধুরন্ধর অর্থলোভী ব্যক্তি সেই জমি কিনে একশ'গুণ বেশি দাম ঘুষ দিয়ে ব্যাংক থেকে লাখ লাখ টাকা লোনও নেবেন না। একদিকে রোগী অন্যদিকে ডাক্তার, একদিকে ব্যাংক অন্যদিকে ব্যবসায়ী.... এইভাবে সমাজের সর্বস্তর থেকে দুর্নীতি, ঘুষ এবং যাবতীয় অন্যায় দূর হবে। একটা কাজের সঙ্গে আরেকটি কাজ জড়িত, একটি জীবনের সঙ্গে আরেকটি জীবন জড়িত। আল্লাহর আইনের অধীনস্থ সকল মানুষের জীবনধারা ও চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণ বদলে যায়। আল্লাহর আইন অসৎকে সৎ, অস্থির সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুস্থির, সৎ ও সুন্দর করে। আর মানুষের বুদ্ধিজাত স্বার্থান্বেষী আইন ধীরে ধীরে সমাজ সভ্যতাকে ধ্বংস করে।

বিশ্বাসের পরের স্তরই হচ্ছে নিয়মকানুন। মানুষ যদি বিশ্বাস করে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে এবং তিনি সবকিছুর যেমন নিয়ন্তা তেমনি হিসাব গ্রহণকারী, তাহলে মানুষটি কোরআন হাদীসের সকল আইন মেনে চলবেন। তার জীবনধারা হবে এক ধরনের।

www.bjilibrary.com

আবার কেউ যদি বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তার দেয়া নিয়ম-কানুন কিছু মানবো, কিছু মানবো না তবে তার জীবনধারা হবে অন্য ধরনের। আবার একজন নাস্তিকের জীবনধারা হবে ভিন্ন ধরনের। কারণ দেশের প্রচলিত মানুষের তৈরি আইনের কাছেই সে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদদৌলার পতনের পর বৃটিশরা সর্বপ্রথম এদেশের ইসলামী বিচার ব্যবস্থাকে বাতিল করে, ইসলামী আইনও সঙ্গত কারণে বাতিল হয়ে যায়। তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের নিজেদের তৈরি করা আইন প্রবর্তন করে। সেই আইনকে ভিত্তি করে মানুষের জীবনধারা গড়ে ওঠে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আজো সেই একই আইন বিদ্যমান। পরিবর্তন যা হয়েছে তাও মানুষের ইচ্ছামত আইন তৈরির মাধ্যমে হয়েছে। যার জন্য উক্ত দেশগুলির মানুষের জীবনধারা, চিন্তা ও আদর্শের সঙ্গে অমিলের সঙ্গে মিলই বেশি।

কোরআন ও হাদীস মুখস্থ করা, পাঠ করা বা আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এক জিনিস আর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনের মাধ্যমে সেই অনুযায়ী ফয়সালা করা এবং মেনে চলা, পালন করা ভিন্ন জিনিস।

আমাদের সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের স্বরূপ

আমাদের সাহিত্যে, কবিতায়, সংগীতে, চারুকলা বা স্থাপত্যে অর্থাৎ জীবনের সমস্ত সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির সর্বস্তরে একই নমুনা- তাই উপন্যাস ও সাহিত্যে যা রচিত হয়েছে তা হয়েছে সেই একই আইন-কানুনকে ভিত্তি করে জীবন যাপনকারী মানুষের বিশ্বাসের আলোকে এবং সেই আইন-কানুন, বিচারব্যবস্থা, দণ্ড বা শাস্তিকে চিন্তাধারার মধ্যে লালন করে।

চরিত্র চিত্রন, ঘটনা প্রবাহ, সংলাপের বক্তব্য বা সেই আদলে কাহিনী বানিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হলে বরং মানুষের তৈরি করা আইনকে বৈধ হিসাবে সার্টিফিকেট দেয়া হবে এবং তাকেই শক্তিশালী করা হবে। আর এটা যতবেশি শক্তিশালী হবে, ততই আল্লাহতাআলার আইনের সৌন্দর্য তার কল্যাণকারিতা, তার সার্বজনীন শান্তিময় পরিবেশ পরিস্থিতির যে রূপমহিমা তা মানুষের চিন্তাধারা থেকে লোপ পেয়ে যাবে। যুগ যুগ ধরে বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে আসা ফিতনা- ফ্যাসাদের মধ্যেই মানুষ বসবাস করবে, আর আল্লাহর আইনের চিরন্তন জান্নাতি সুখের পরিচয় তার কাছে অনুদ্ঘাটিত থেকে যাবে, অপরিবর্তিত থেকে যাবে। দুর্গন্ধময় স্থানে বসবাস করে বারবার আতর ছড়ানো ছিটানোতে কোন লাভ নেই। বরং সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে সুগন্ধময় বিশুদ্ধ বাতাসে বেরিয়ে আসতে হবে।

www.bjilibrary.com

রসূলুল্লাহ (সা.) যেমন সমস্ত জাহেলী উদ্ভুত সমস্যা, বিরোধ, বিচার-আচার, লেন-দেন একথায় সমস্ত জাহেলী সংস্কৃতিকে বাতিল করে সোজা এক আল্লাহর আইনের অধীনে আসতে মানুষকে আহ্বান করেছিলেন।

আল্লাহর আইনকে ভিত্তি করে যে জীবন পদ্ধতি তৈরি হয়েছিল তার নমুনা সাহাবা কেরামদের যুগে প্রত্যক্ষ করা যায়। পরবর্তীতে কিছুকাল সেই জীবনধারার সুবাতাস বয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যেতে পারে আল্লাহর আইনের অধীনে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির রূপ ও রসময়তা কেমন মধুর ছিল। আমাদের সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে, যা চলছে তার চিত্র প্রবলভাবে বিদ্যমান, অথবা যা হওয়া বাঞ্ছনীয় তা অনুপস্থিত।

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : একই সত্তার দুটি নাম

রসূলুল্লাহ (সা.) এর সময়ে মক্কী যুগের পশুত্ব, কদর্যতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা থেকে বর্তমানকাল কোন অংশে কম নয়। বরং অনেকক্ষেত্রে তার বিভৎসতা ও নিকৃষ্টতা সীমা অতিক্রম করে গেছে। তাই আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে সেই চলচ্চিত্রই অধ্যয়ন করতে হবে যা মানুষের বাহিরলোক নয়, অন্তরলোককে জাগ্রত করে। যদিও আল্লাহর দেয়া আইন-কানুনে বিশ্বাসী লেখকরা এ পর্যন্ত যা রচনা করেছেন তার সব ঘটনা, চরিত্র এবং ব্যঞ্জনা ইসলামহীন নয় বরং বলা যেতে পারে ইসলামবিরোধী সমাজ থেকে নেয়া। মানুষের তৈরি আইনের বন্দুক দিয়ে শিকার করা সব যেন আহত, রক্তাক্ত কাদামাটি মাখা পশুর মত। তাতে মানবতা কেঁদে উঠলেও মনুষ্যত্ব কাঁদে না, মনুষ্যত্ব দ্বিধান্বিত হয়, কম্পিত হয়, আতঙ্কিত হয়। সাহিত্যই চলচ্চিত্রের আশ্রয়স্থল, তাই সাহিত্যের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে চলচ্চিত্রের সমস্ত শরীরটাও তেমনি কদর্য এবং মানুষের তৈরি আইনের কালিতে কলঙ্কিত।

তবুও আশার বিষয়, হাতে গোনা কিছু, দুই বা একটা- সাহিত্য পাওয়া যায় যার রচনার ভিত্তিমূল তৌহিদ এবং উদ্দেশ্যও তৌহিদ। যদিও তার সাহিত্যরস প্রবলভাবে প্রবাহিত নয়, কারণ চেপে ধরা কণ্ঠ আর কত জোরে চিৎকার করবে। তবুও সেসব সাহিত্য অন্ধকারে দূর থেকে আগত আলোকরশ্মির আলোকময় হাতছানি যেন। যেমন খাদিজা আখতার রেজায়ীর কিছু উপন্যাস চোখে পড়ে। "কোরআনের জবানবন্দী", "জান্নাতের মানচিত্র" ইত্যাদি। এছাড়া ফররুখ আহমদের কাব্যনাটক, ইকবালের কাব্য নাটককে ভিত্তি করে এবং কিছু বীর সাহসী এবং জিহাদী মুসলিম ব্যক্তিবর্গের জীবন ইতিহাস নিয়ে চলচ্চিত্র করা যেতে পারে অনায়াসে।

www.bjilibrary.com

এসব ছাড়া প্রবন্ধকারের দৃষ্টিতে এমন কোন উপন্যাস, নাটক বা গল্প পড়েনি যার ভিত্তি, গতিপ্রবাহ, চরিত্র চিত্রণের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তৌহিদ। মনে হয়েছে এসব রচনা ছাড়া বাকী সব রচনা সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়া অথবা সাহিত্যিক হিসাবে ইসলাম ও জাহেলিয়াত দুই গ্রুপে নাম কেনার উদ্দেশ্যে রচিত।

তবে শিক্ষার্থীরা ইমাম গাজ্জালী (রহ.)-এর রচনা, জালালউদ্দীন, রুমী এবং শেখ সাদী (রহ.)-এর রচনা পড়ে দেখতে পারেন, যার মধ্যে ছোট ছোট উপদেশমূলক বহু সত্য ও কাল্পনিক গল্প আছে, যার ভিত্তি ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তৌহিদ। তা থেকে উৎকৃষ্টমানের চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব।

নিরীক্ষাধর্মী, আর্টছবি, বিকল্পধারার ছবি... ইত্যাদি শব্দগুলির অর্থ থাকলেও দুর্বল চলচ্চিত্র পরিচালক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মীরা শব্দগুলির মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। যেমন একশ্রেণীর লোক 'আরব্য রজনী' বা 'পারস্য উপন্যাস'কে মুসলমানদের রচনা বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে রেখেছে। আসলে এগুলো লেখকের নাম বর্জিত পুস্তক যা মুসলমানদের সিরিয়া বিজয়ের পর সেখানকার অগ্নি উপাসকরা রচনা করেছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী।

কোন জটিলতা বা বিভ্রান্তির শিকার না হয়ে শিক্ষার্থীরা এমন কাহিনীধর্মী সাহিত্য বেছে নেবেন যা বাহ্যিক ও অন্তর্লোকের রূপ ও চিন্তাদর্শকে প্রকাশ করবে বা তার কথা বলবে। যাতে দর্শকদের সুপ্ত চিন্তা অর্থাৎ 'ফিতরাত' বা সহজাত চরিত্র এবং বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করে। মন্দ থেকে বিরত রাখে এবং এক আল্লাহর আইন পালনে উৎসাহিত করে। এখনকার চলচ্চিত্র এমনই চাই। তবে সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র উপযোগী বিষয়বস্তু বেছে নেবার জ্ঞান অর্জন করতে হলে চলচ্চিত্র টেকনিক, বিশেষ করে চিত্রনাট্য বিষয়ে ব্যাকরণভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর চিত্রনাট্য পুস্তকনির্ভর জ্ঞান নয়, এটা অভিজ্ঞতানির্ভর জ্ঞান।

বর্তমানে ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। যার বিশেষ কিছু চলচ্চিত্রায়ন সম্ভব। যা পড়ে বা পাঠ করে মানুষের অন্তর্লোকের চিন্তা-আদর্শ জাগ্রত হয়- এসব সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ন অবশ্যই মানুষের অন্তর্লোকের সুপ্ত সহজাত বিশ্বাসকে জাগ্রত করবে, এবং প্রতিষ্ঠা করবে। শিক্ষার্থীদেরকে মনে রাখতে হবে চলচ্চিত্র মানুষের মনের সুপ্ত চিন্তাধারাকে উসকে দেয়। চলচ্চিত্র কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে না, মানুষের মনকে ঘুরিয়ে অন্য খাতে প্রবাহিত করে না। চলচ্চিত্র মানুষকে কিছু ধারণা দিতে পারে কিন্তু ধারণাকে বিশ্বাস হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তাই কোরআন ও হাদীসের বক্তব্য হিসাবে মানুষের ফিতরাত'ই ইসলাম- এই ফিতরাতকে উস্কে দেয়া, জাগ্রত করা ও প্রতিষ্ঠা করার কাজে ইসলামী সাহিত্য যে ভূমিকা রাখে,

www.bjilibrary.com

সেটাকে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করার জন্য চলচ্চিত্রের বিকল্প নেই। চলচ্চিত্রের মূল কাজ এটাই।

এতবড় সুযোগ থেকে পশ্চাৎপদ মুসলিম জাতিকে চলচ্চিত্রের দিকে এগিয়ে আসা উচিত আগ্রহীরা ভালোভাবে চলচ্চিত্র শিক্ষাকে রপ্ত করতে পারলে ইসলামী সাহিত্যকে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়ে বিশ্ববিবেকের দরবারে হাজির করতে পারবে। ভালোভাবে রপ্ত করার অর্থ, এমনভাবে যেন সাহিত্যের বিমূর্তকে চিত্রায়ন করার জ্ঞান রপ্ত করা যায়। যা অন্তর্লোককে আবর্তন ও বিবর্তন করে ফিতরাতকে শক্তিশালী করে, জাগ্রত ও প্রকাশ করে। যা চলে আসছে তা নয়- যা তৈরি হবে তা-ই প্রতিষ্ঠা পাবে ইনশাআল্লাহ।

www.bjilibrary.com

ইসলামী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামী আন্দোলনকে গতিশীল ও তরান্বিত করার জন্য যদি চলচ্চিত্র তৈরি হয় তবে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর কাছে বিষয়টি অনেক বেশী সুখের ও প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়াবে।

রুশ বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে যেসব চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিলো, সেসব চলচ্চিত্র যেমন ঐসব দেশের জনগণের প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিলো তেমনি আজও পৃথিবীর চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের কাছে অনুসরণীয় হয়ে আছে। সেসব পরিচালকদের চিন্তাধারার গভীরতা, বিশাল হৃদয়বৃত্তি ও জ্ঞানের প্রসারতা আজও গবেষকদের গবেষণার বিষয়। আর তাদের চলচ্চিত্রগুলোও আজ অবধি চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের কাছে অনুসরণীয় হয়ে আছে। কারণ সেসব চলচ্চিত্র স্ব-স্ব দেশের বিপ্লবকে সারাবিশ্বে পৌছে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়েছিল। একটি আন্দোলনমুখী চলচ্চিত্র যদি চলচ্চিত্রধর্মী হয়ে না ওঠে তবে তা অনুতাপের বৈকি! তাই যারা আন্দোলনমুখী চলচ্চিত্র তৈরি করতে চান তাদেরকে চলচ্চিত্র তৈরিতে যে শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয় সেই ভাসাভাসা অভিজ্ঞতা দিয়ে একই শ্রম ও অর্থ দিয়ে সত্যিকার চলচ্চিত্র শিক্ষালাভ করে চলচ্চিত্র নির্মাণে অগ্রসর হওয়া উচিত। যাতে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য তার সার্বজনীনতা ও শাশ্বত রূপ প্রতিটি মানুষের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হয়। যারা চলচ্চিত্র দেখার ব্যাপারে শিক্ষিত এবং গল্প বা উপন্যাস সাহিত্যের রসাস্বাদনে অভ্যস্ত এবং মানসিকভাবে পোক্ত, তারা চলচ্চিত্র আস্বাদন করেন এক ধরনের উপলব্ধি দিয়ে। আর যারা চলচ্চিত্র দেখার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বা চলচ্চিত্রের নানা বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা

www.bjilibrary.com

করেন না, উপন্যাস বা গল্প সাহিত্যের রসাস্বাদনে অভ্যস্ত নন, চলচ্চিত্র দেখার আস্বাদন তাদের কাছে আরেক ধরনের। চলচ্চিত্র দেখার, বুঝার ও আস্বাদনের ব্যাপারে ইসলামী আন্দোলন বহির্ভূত দর্শকরা এক্ষেত্রে অনেক বেশি এগিয়ে আছে, ফলে চলচ্চিত্র বিষয় তারা অবশ্যই শিক্ষিত ও সজাগ, ব্যাপারটি ইসলামী আন্দোলনের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করা হয়। দর্শকের অন্তরের নিভৃতে যে স্বপ্ন বা ইচ্ছা লালিত হয় তা চলচ্চিত্রের বদৌলতে জীবন্ত ও শক্তিশালী হচ্ছে না বিকৃত পথে ধাবিত হচ্ছে- এ বিষয়ে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের গভীর পর্যবেক্ষণ থাকা দরকার।

এ কথাও জানা দরকার যে রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্মের প্রতি গভীর আনুগত্যের ফলে চলচ্চিত্রের অনেক দর্শক চলচ্চিত্রটিকে চলচ্চিত্র হিসেবে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি, তা গ্রহণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মতের স্বপক্ষে কথা শোনা যাচ্ছে বলে চলচ্চিত্রের অন্যান্য গুণাগুণ সে না পারে আস্বাদন করতে না পারে মূল্যায়ন করতে। চলচ্চিত্র দেখার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করে। লিখিত আকারে যা কিছু আমরা পড়ি, তার প্রতিটি অক্ষর, শব্দ এবং বাক্যের অর্থ আমরা বুঝি, কারণ ছোটবেলা থেকে আমরা উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করি। মানুষের সাথে কথা আদান-প্রদান করতে করতে নিরক্ষর ব্যক্তিও শব্দ ও বাক্যের অর্থ আয়ত্ব করে থাকে। চলচ্চিত্রও তদ্রুপ। কলম দিয়ে অক্ষর, শব্দ ও বাক্য লেখা হয়। আর চলচ্চিত্রে ক্যামেরা দিয়ে শট নামক অক্ষর সাজানো হয়। তারপর শট এর পর শট্ সাজিয়ে শব্দ ও বাক্য নামক সিন তৈরি হয়। অতএব প্রতিটি শট্ এর নাম, তার এঙ্গেল, অর্থ, কম্পোজিশান, ফ্রেম, অভিনয় শিল্পীর অঙ্গভঙ্গি এবং মৌখিক ক্রিয়া, আলোক সম্পাত, সংগীত, স্থপত্যশৈলী, স্থিরচিত্র... মোট কথা চলচ্চিত্র বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। অশ্লীল চলচ্চিত্রের দর্শক যেমন আছে, সুস্থ-শিল্পসম্মত চলচ্চিত্রের দর্শকও তেমনি বিদ্যমান। বটতলার উপন্যাস পড়ার পাঠক যেমন আছে, ক্লাসিক পড়ার পাঠকও বিদ্যমান। সুস্থ শিল্পসম্মত রুচির দর্শক তৈরিতে ফিল্ম সোসাইটিগুলো কাজ করে থাকে। আমাদের দেশে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ইসলামী আন্দোলনের জন্য চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে, যেহেতু ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা অন্যাদের চেয়ে শিক্ষিত ও জ্ঞানী সেহেতু ধারণা হওয়া স্বাভাবিক তারাও চলচ্চিত্রের দর্শক হওয়ার ব্যাপারে শিক্ষিত। কিন্তু ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ চলচ্চিত্র সৃষ্টির পর থেকে আমরা সবাই কমবেশি অশ্লীল অপসংস্কৃতির চলচ্চিত্র দেখতে অভ্যস্ত। তাই চলচ্চিত্র থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া স্বাভাবিক। যার জন্যে

www.bjilibrary.com

অনেকের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র চর্চা আর হয়ে ওঠেনি। চলচ্চিত্র যুগপৎ দেখা, শোনা ও পড়ার বিষয়। এটার জন্য পৃথকভাবে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন। এর জন্য ফিল্ম সোসাইটি প্রয়োজন। যারা পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর শিল্পসম্মত চলচ্চিত্রগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে তা বিশেষণ করে করে চলচ্চিত্রবোদ্ধা দর্শক তৈরি করবে। চলচ্চিত্র নির্মাতাগোষ্ঠী, চলচ্চিত্র প্রদর্শক, চলচ্চিত্র বাজারজাত, চলচ্চিত্রের প্রচার বা বিজ্ঞাপন-এসব যে পৃথক পৃথক বিজ্ঞান-চলচ্চিত্র বিষয়ক শিক্ষা লাভ না করলে বিষয়টি বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়।

যেহেতু প্রদর্শক, বাজারজাত, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক তৈরি করেই আমরা চলচ্চিত্র নির্মাণ করছি সেহেতু ইসলামী আন্দোলনের চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরকে শুধুমাত্র নির্বাচিত ও সমর্থক দর্শকদের আনন্দ ও বোধের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ না করে বৃহত্তর দর্শক সমষ্টির জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করা উচিত। পাশাপাশি সব বিষয়ে অভিজ্ঞ, দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন নইলে সমাজ পরিবর্তনের যে উদ্দেশ্য তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আদর্শিক চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য হলো ভাবাদর্শকে বিরোধীপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। তাই যুক্তির অবতারণা এবং বিশেষণ ক্ষমতা দিয়ে বিরোধী দর্শকদের মনের মধ্যে যে ক্ষোভ, অন্ধত্ব এবং বিকার রয়েছে তা দূরীভূত করার চেষ্টা করা। চলচ্চিত্রটি যেন দর্শকের অনুভবকে জাগ্রত করে এবং কোনভাবেই যেন বিরোধীদের উপর নির্বাচিত ও সমর্থক দর্শকরা উত্তেজিত না হয়ে পড়ে। আবার বিরোধী গোষ্ঠীর মনের মধ্যেও যেনো আরো তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার না হয়।

নিজের রুচি মাফিক চলচ্চিত্র তৈরি করার অধিকার পরিচালকের আছে। তেমনি দর্শক ও দাবি করবে তার বিচার বুদ্ধিকে যথোচিত সম্মান করা হোক। অন্যদিকে চলচ্চিত্রটি যদি কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরি হয় তবে পরিচালকের নিজস্ব রুচি অনেক সময় পরিত্যাগ করতে হয়-সেখানে বৃহত্তর আন্দোলনের দাবিকে প্রতিফলিত করা উচিত চলচ্চিত্রিক নিয়মে এবং যথাযথভাবে স্থান-কাল পাত্র, রীতি-নীতি ও সংগতি মেনে আন্দোলন এবং তার উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

চলচ্চিত্রের টেকনিক তার উপস্থাপনা, ব্যক্ত করার ভঙ্গি, কাহিনী বর্ণনা, চিত্রনাট্য, সংলাপ বিভিন্ন শটের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া এ্যাকশন এবং রি এ্যাকশন-এর মাত্রা সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। ভাসাভাসা জ্ঞান নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করলে হতে পারে তা ইসলামী আন্দোলনকেই হাস্যপদ করে তুলবে। অনেকে ব্যক্তি উদ্যোগ একটা আদর্শিক চলচ্চিত্র তৈরি করতে পারেন, সমস্ত দায়িত্ব তখন ঐ ব্যক্তিকেই বহন করতে হয়। কিন্তু যখন চলচ্চিত্রটির ব্যানার হয় বৃহত্তর

www.bjilibrary.com

সংগঠন তখন সমস্ত দায়-দায়িত্ব সমালোচনা সবই সংগঠনের ওপর বর্তায়। তাই ব্যানারের সম্মান, ভাবগাম্ভীর্য, মর্যাদা রক্ষা এবং সংগনটির বক্তব্য, মতামত আদর্শ ও রুচি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সজাগ থাকা চলচ্চিত্র নির্মাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শটি পুরোপুরি সাংগঠনিক দৃষ্টিতে যথাযথ কিনা সে ব্যাপারেও সজাগ থাকতে হবে। আর সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয় চলচ্চিত্রটির কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সে প্রশ্নের উত্তর যেন যৌক্তিকভাবে দেয়া সম্ভব হয়।

ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার চলচ্চিত্র আবির্ভাবের সময় বহু বিরূপ মন্তব্যের শিকার হয়েছিলো- বিশেষ কিছু কারণে। পরবর্তীতে সময়পোযোগী যৌক্তিক নিয়মাবলী সম্বলিত সেন্সর নীতিমালা তৈরি করেন তারা। এর পরে বিরূপ সমালোচনা হলেও সে সমালোচনা মূলতঃ গঠনমূলক ও সংশোধনের পর্যায়ে কেন্দ্রিভূত হয়ে যায়। যার জন্য তিক্তকর পরিস্থিতি আর সৃষ্টি হয়নি। অতএব ইসলামী আন্দোলনের চলচ্চিত্রের জন্য অবশ্যই সেন্সর নীতিমালা তৈরি করা প্রয়োজন। যার মধ্যদিয়ে শরীয়ত, ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পরিচয় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবে। চলচ্চিত্রের নানা রকম ক্যাটাগরির মধ্যে একটি ক্যাটাগরি হলো রাজনৈতিক চলচ্চিত্র। যদিও সব চলচ্চিত্রের মধ্যে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু যেসব চলচ্চিত্রে সরাসরি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হয়, সেগুলোই মূলতঃ রাজনৈতিক চলচ্চিত্র।

এ ধরনের বিশ্বমানের চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে- বার্থ অফ এ নেশন, ইনটলারেন্স, ব্যাটলশিপ পোটেমকিন, আইভান দি টেরিবল, সিটিজেন কে এন, দ্যা ইমিগ্রান্ট, দ্যা ব্যাটস অফ আলজিয়ার্স, ওপেন সিটি, গান্ধী, নেপোলিয়ান ইত্যাদি। ভারতের প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন ১৯৬৮ তে 'ইন্টারভিউ' নামে একটি ছবি তৈরি করেন যেটাকে ভারতের রাজনৈতিক ছবির পথিকৃৎ বলা হয়। আমাদের দেশে রাজনৈতিক ছবি হয়েছে জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া'-এছাড়া আর যেসব ছবি হয়েছে তা চলচ্চিত্র গুণসম্পন্ন নয় বলে মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। আর তাই চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সেসব ছবি অনুপস্থিত।

বিশ্বখ্যাত ছবিগুলোর রেফারেন্স আনা হলো এ কারণে যে, কোন খেলনা উড়োজাহাজ বা গাড়ি তৈরি করতে হলেও মূল বস্তুটিকে সামনে রাখতে হয়। তাই মৌলিকত্বের ভূষণে ভূষিত পিতৃছবিকে মূল্যায়ন করতেই হবে। তা চর্চা করতে হবে। ভাবতে হবে... ভাবনার মধ্যে লালন করতে হবে। তার কাঠামো, বিন্যাস, ব্যঞ্জনা, স্থাপত্যশৈলী, মনস্তাত্ত্বিকতা এবং সামগ্রিকতাকে চর্চা না করে রাজনৈতিক

www.bjilibrary.com

চলচ্চিত্র বানানো আহম্মকি ছাড়া আর কিছু নয়। রাজনৈতিক চলচ্চিত্র করবো কিন্তু তার সম্পর্কে কোন কিছু চর্চা করবো না এটা হয় না। আগুনকে অস্বীকার করে আলো জ্বালানো সম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

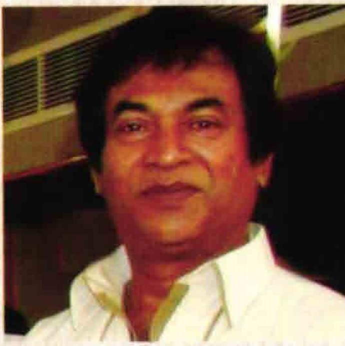

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন

১৯৫১ সালের ১৮ এপ্রিল সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার দরগাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শেখ আবুল হোসেন। মায়ের নাম হাফিজা খাতুন। তার পড়াশোনায় হাতেখড়ি নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, পরে বাড়ুলি হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯৬৯ সালে দরগাপুর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে খুলনার সিটি কলেজে ভর্তি হন। একই কলেজ থেকে এইচএসসি ও বিএসসি সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন। খুলনায় অবস্থানকালে দৈনিক কালান্তরে লেখালেখির মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরবর্তীতে সাপ্তাহিক ইত্তেহাদের সাহিত্য সম্পাদক ও দৈনিক আবর্তন এর সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকায় এসে শেখ আবুল কাসেম মিঠুন বিনোদন সাংবাদিকতায় নিয়োজিত হন। সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়মিত এফডিসিতে যেতেন। সেই সময় তার সুদর্শন চেহারা দেখে মুগ্ধ হন চিত্রপরিচালক হাফিজ উদ্দিন ও আলমগীর কুমকুম। তাদের আমন্ত্রণে মূলত অভিনয়ের জগতে প্রবেশ শেখ মিঠুনের। শুরু হয় শেখ মিঠুনের অন্য এক বিচিত্র জীবনপ্রবাহ। ১৯৮০ সালে বজলুর রহমান পরিচালিত 'তরুলতা' নামক চলচ্চিত্রে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। এরপর তিনি অভিনয় করেন বহু সুপারহিট চলচ্চিত্রে। ১৯৮২ সালে শেখ নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'ঈদ মোবারক' চলচ্চিত্রে নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন। পরে ভেজা চোখ, গৃহলক্ষ্মী, নরম-গরম, স্যারেন্ডার, নিঃস্বার্থ, বাবা কেন চাকর,

www.bjilibrary.com

বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না, নিকাহ, গাড়িয়াল ভাই, রঙ্গিলা, ভাগ্যবতী, ধনবান, কুসুম কলি, অর্জন, ত্যাগ, বাদশাহ ভাই, জেলহাজত, ত্যাজ্যপুত্র, উল্লেখযোগ্য। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি গানও রচনা করতেন। 'তরুলতা' নামক চলচ্চিত্রে তিনি গীতিকার হিসেবে গান রচনা করেন। তিনি খুলনায় থাকতে খুলনা বেতারের নিয়মিত গীতিকার হিসেবে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। চলচ্চিত্রের কর্মময় জীবনে তিনি ১৯৮৯-৯১ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক এবং ১৯৯৩-৯৫ সালে আন্তর্জাতিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র লেখক সমিতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। ২০০০ সালে সমিতির সহসভাপতি এবং ২০০১ সালে সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির পক্ষ থেকে ২০১৪ সালে তাকে চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আজীবন সদস্য সম্মাননা প্রদান করা হয়।

২০০০ সালে তিনি সিনেমার অভিনয় থেকে সরে দাঁড়ান। তারপরও তিনি স্ক্রিপ্ট রাইটার ও গীতিকার হিসেবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের উপ-পরিচালক ও সাহিত্য-সংস্কৃতি কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্বসহ বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। শেখ আবুল কাসেম মিঠুন ২০১৫ সালের ২৫ মে ইন্তেকাল করেন।

৭৪ এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত উপন্যাস 'আমরাই' গ্রন্থটি ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর তার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শিক্ষা ও সংস্কৃতির নেতৃত্বঃ সংকট ও সংঘাত' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে। তিনি আমৃত্যু চলচ্চিত্র, নাটক, সংস্কৃতি, মিডিয়াসহ বহুবিধ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে গেছেন। তাঁর ১টি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিসহ বেশকিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ এখনো অগ্রন্থিত রয়েছে। চলচ্চিত্র ও নাটক বিষয়ক তার ৭টি প্রবন্ধ নিয়ে 'ইসলামে চলচ্চিত্র ও নাটক' গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে। আশা করছি গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।

www.bjilibrary.com

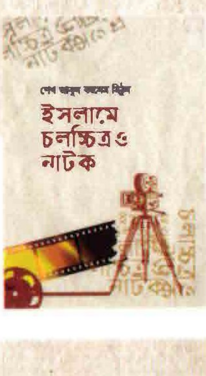

Islame Cholochitro o Natok
Written By **Shekh Abul Kasem Mithun**
Published on January 2024
Price: 250 Tk only

ISBN: 978-984-97658-4-4
978-984-97658-4-4